দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতীয় রাজনীতি

শ্রীজ্ঞান হালদার

ইউনিভার্সিটি লীডারশিপ প্রোগ্রাম
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

নিবেদন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের পরিচালনায় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের আর্থিক সহায়তায় 'ইউনিভার্সিটি লীডারশিপ প্রোগ্রাম'-এর প্রকাশনা কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে এই পুস্তক প্রকাশ করা হল। এই কর্মসূচীতে এর আগে পাঁচটি পুস্তক/পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান পুস্তকটি ষষ্ঠ ও সর্বশেষ প্রকাশনা। পূর্ববর্তী প্রকাশনাগুলির মত বর্তমান পুস্তকটিও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর স্তরের ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজন মেটাবে আশা রাখি। আমাদের ধারণা সুধী শিক্ষকমণ্ডলী ও এ বিষয়ে আগ্রহী সকলের কাছে এই পুস্তকটি আদৃত হবে। লেখক যে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন তা তাঁর নিজস্ব। এই বক্তব্য সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নাও মনে হতে পারে। তবে রচনাটিতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তুলে ধরা হয়েছে ; তথ্য ও বিশ্লেষণের সমাবেশ ঘটিয়ে গ্রন্থকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সংকটকালকে নিজস্ব ভঙ্গীতে বিচার করার চেষ্টা করেছেন, রচনাটির তাৎপর্য এইখানে।

'ইউনিভার্সিটি লীডারশিপ প্রোগ্রাম' পরিচালনার ব্যাপারে এবং বিশেষভাবে প্রকাশনার কাজে উপাচার্য অধ্যাপক ড. সন্তোষ কুমার ভট্টাচার্য, সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক প্রদীপ কুমার মুখোপাধ্যায়, সহ-উপাচার্য (অর্থ) ড. দিলীপ কুমার সিংহ-এর কাছে প্রভূত উৎসাহ ও সাহায্য পেয়েছি। তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। গ্রন্থকারকে এই রচনার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১০ নভেম্বর ১৯৮৬

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
বিভাগীয় প্রধান ও পরিচালক
ইউনিভার্সিটি লীডারশিপ প্রোগ্রাম

প্রথম অধ্যায়

সূত্রপাত—যে কোন দেশের ইতিহাসেই যুদ্ধের তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক এবং গভীর। সেই যুদ্ধ যদি বিশ্বযুদ্ধ হয় তবে তার তাৎপর্য এবং গুরুত্বও অনেক বেশী বেড়ে যায়। ভারতবর্ষের রাজনীতিক, আর্থনীতিক এবং সামাজিক জীবনে দুটি বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবই পড়েছে খুব গভীরভাবে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্বের সঙ্গে এবং তার পরিণতির সঙ্গে এই কারণেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং বিশেষ করে তার চূড়ান্ত পর্যায় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করবার জন্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে এই কালপর্বের ভারতীয় রাজনীতির সম্পর্ক এবং তার পটভূমির প্রাসঙ্গিক আলোচনা একান্ত প্রয়োজন। এই আলোচনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের দ্বন্দ্ব, জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে বিভিন্ন মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব এবং তার সঙ্গে শ্রেণীগুলির সম্পর্ক ও ভূমিকার প্রশ্নগুলি। পরবর্তী আলোচনায় আমরা এই সমস্ত দিকগুলির সাধ্যমত সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ ও বর্ণনার চেষ্টা করব।

পূর্বকথা—ইওরোপীয় উপনিবেশবাদী শক্তিগুলির কাছে ভারত সাম্রাজ্যের গুরুত্ব অন্যান্য সাম্রাজ্যের থেকে অনেক বেশী ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীব্যাপী ব্রিটেন-ফ্রান্সের নিয়ত দ্বন্দ্বের সবচেয়ে বড় কারণগুলোর মধ্যে একটা ছিল ভারতের উপরে আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতা। ব্রিটেনের দিক থেকে আমেরিকার উপনিবেশগুলি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় ভারতই প্রধানতম ঔপনিবেশিক বনিয়াদ হয়ে দাঁড়ায়। অপরদিকে নেপোলিয়নের মিশর ও মধ্যপ্রাচ্য আক্রমণের সময় তার দৃষ্টি ছিল ভারতবর্ষের দিকে।[১] আর্থনীতিক শোষণের বিপুল উৎস হিসাবে এবং রাজনীতিক ও সামরিক অবস্থাগত দিক থেকে ভারতবর্ষ একই সঙ্গে লোভনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র ছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা ভারতের সুপ্রচুর সম্পদ এবং জনবলকে শুধু ভারতের উপরে ঔপনিবেশিক আধিপত্য বজায় রাখার জন্যেই যে ব্যবহার করে তা নয়, সমস্ত এশিয়ায় সাম্রাজ্যবিস্তারের জন্যে যথাসম্ভব কাজে লাগায়। আফগানিস্তান, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, চীন, ইরান, ইরাক, আরব, মিশর এবং ইথিওপিয়া সর্বত্রই ভারতীয় সৈন্যদের ব্যাপক হারে যুদ্ধের কাজে লাগানো হয় এবং ভারত থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবিস্তারের

প্রয়োজনে যুদ্ধের রসদ সংগ্রহ করা হয়। এই নীতি বরাবরই ব্রিটিশ সরকার বজায় রেখেছিল। ভারতের সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক লর্ড রলিনসন (Rawlinson) কর্তৃক ১৯২১ সালে প্রদত্ত বিবরণ থেকে জানা যায় যে ভারতের সামরিকবাহিনীকে প্রধানত তিনটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথমটি, ফিল্ড আর্মি—চারটি ঘোড়সওয়ার ব্রিগেডসহ চার ডিভিশন আধুনিকভাবে সজ্জিত সৈন্যের এই বিপুল বাহিনী কেবল ভারতের বাইরে খুব গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে পাঠানো হত। দ্বিতীয়, সীমান্তরক্ষীবাহিনী—এই বাহিনীকে প্রথম আক্রমণ মোকাবিলার জন্য তৈরি করা হত। সর্বশেষ, আভ্যন্তরিক নিরাপত্তাবাহিনী—ভারতীয় জনগণের বিদ্রোহ ও গণ আন্দোলন দমনের জন্যে যাকে ব্যবহার করা হত।[২]

ভারত সাম্রাজ্যকে অন্যান্য এশীয় দেশগুলোর উপর চাপশক্তির এবং প্রভাব বিস্তারের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করবার উদ্দেশ্যেই ভারতকে একটা বিশাল সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করা হয়েছিল। ১৯০৫ সালে বাংলা ভাগের জন্যে কুখ্যাত তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জনের নীচে উদ্ধৃত বক্তব্য থেকেই এই নীতির রাজনৈতিক গুরুত্ব খোলাখুলিভাবে বোঝা যায়:

বিশ্বের তৃতীয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশের কেন্দ্রে ভারত সাম্রাজ্যের অবস্থান। ...কিন্তু ভারতের এই আধিপত্যমূলক অবস্থানের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী বোঝা যায় যখন ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ভারতের প্রভাব লক্ষ করা যায়; অথবা, যখন দেখা যায় যে ভারতের প্রতিবেশীদের ভাগ্য তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে।[৩]

ভারতের দরিদ্র জনগণের কাছ থেকে বিপুল অর্থ আদায় করে গড়ে তোলা হয়েছিল ভারতের সৈন্যবাহিনী। কিন্তু এই সামরিকবাহিনীকে ব্যবহার করা হত সাম্রাজ্যবাদী বিস্তারের প্রয়োজনে এবং ভারতবাসীকে দমনের জন্যে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতিকাল থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত একটি তুলনামূলক চিত্রের মাধ্যমে ভারতের উপরে সামরিক কারণে চাপানো আর্থনীতিক বোঝার গুরুত্ব স্পষ্ট হবে:

সামরিক ব্যয় ১৯১৩—২৮*

(নিযুত পাউণ্ডের অঙ্কে)

	১৯১৩	১৯২৮	শতাংশ হারে বৃদ্ধি
ব্রিটেন	৭৭	১১৫	৪৯
ভারত	২২	৪৪	১০০
অধিরাজ্যসমূহ (Dominions)	৯	১২	৩৩
মোট	১০৮	১৭১	৫৭

উপরের চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে ব্রিটেন তার নিজের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যে সামরিক খাতে যে পরিমাণ ব্যয় করে পনর বছর সময়ের মধ্যে তা শতকরা ৫০ ভাগও বাড়েনি, অথচ ভারতের ক্ষেত্রে সেই বরাদ্দের পরিমাণ একই সময়ে পুরোপুরি দ্বিগুণ হয় বা একশ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এই কারণে ১৯১৩-১৪ সালের বাজেটের ৪২.৬ শতাংশ সামরিক খাতে ব্যয় করা হয়। আর এই অঙ্ক ১৯২০-২১ সালে বেড়ে দাঁড়ায় সমগ্র বাজেট বরাদ্দের ৫১ শতাংশে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উন্নয়ন প্রভৃতি অত্যাবশ্যক বেসামরিক খাতে ব্যয় সংকোচের পরিমাণ একটানা বৃদ্ধি করে জনগণের উপরে ক্রমেই করের বোঝা বাড়িয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ১৯৩৮-৩৯ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটের শতকরা ৫৪ ভাগ এবং প্রদেশ ও কেন্দ্রের মিলিত বাজেট বরাদ্দের শতকরা ২৯ ভাগ সামরিক খাতে ব্যয় করা হয়।* এই প্রক্রিয়া ব্রিটিশ শাসনের শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

অপরদিকে প্রথম মহাযুদ্ধে ভারত থেকে প্রায় দশ লক্ষ সৈন্যকে ফ্রান্স, পূর্ব আফ্রিকা, মিশর, ইরাক প্রভৃতি দেশে ব্রিটেনের সাম্রাজ্য রক্ষা এবং বিস্তারের জন্যে পাঠানো হয়। এবং যুদ্ধের জন্যে ভারত থেকে সংগ্রহ করা হয় কোটি কোটি পাউণ্ড।

শুধু ব্রিটেনের সাম্রাজ্য রক্ষা এবং বিস্তারের ঘাঁটি হিসেবেই ভারত সাম্রাজ্যকে ব্যবহার করা হয়নি, ভারতের কাঁচামালে ব্রিটেনের আধুনিক শিল্প গড়ে ওঠে। এবং ভারতের নিজস্ব শিল্প নষ্ট করে এদেশে ব্রিটেনের শিল্পের বিরাট বাজার গড়া হয়।* তাছাড়া ২০ থেকে ৩০ লক্ষ ব্রিটিশ নাগরিক ভারতে অথবা ভারতকে কেন্দ্র করে জীবিকা অর্জন করত। উইনস্টন চার্চিল ১৯৩৩ সালে হাউস অব কমন্সে এক বিবৃতিতে এই কথা জানান। ১৯৩৫ সালে চার্চিল এক বেতার ভাষণে ব্রিটেনের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার ভয়াবহ

চিত্র দিয়ে বলেছিলেন যে, ব্রিটেনে এক লক্ষ লোক বেকার ভাতায় জীবন ধারণ করে, ভারত স্বাধীন হলে অন্তত আরও ২০ লক্ষ লোক বেকার হয়ে যাবে।[৭] এমনকি ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণীও ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ফলে এত বেশী লাভবান্ হয় যে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেও ঔপনিবেশিক শোষণের একান্ত অনুরাগী একটা বিরাট অংশ ছিল—ব্রিটেনের শ্রমিক আন্দোলন যার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[৮] অপরদিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং ইওরোপের রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক ভারসাম্যের ক্ষেত্রে ব্রিটেনের যে ঘাটতি পড়ত কেবল ভারতে ব্রিটিশ পণ্য রপ্তানি করে সেই ঘাটতির দুই-পঞ্চমাংশ মেটানো হত।[৯]

ব্রিটেনের উদ্বৃত্তির সবচেয়ে বড় উৎস ছিল ভারত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত তার আর্থনীতিক, প্রশাসনিক এবং রাজনীতিক অবস্থাটা সংক্ষেপে একবার দেখা যাক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে এবং অব্যবহিত পরে ১৯১৬-১৭, ১৯১৭-১৮ এবং ১৯১৮-১৯ সালে ভারত সরকার অবিশ্বাস্য হারে কর-ভার বৃদ্ধি করে। তিন বছরে এই বৃদ্ধির মোট পরিমাণ ছিল ৪০ শতাংশ। ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ সরকারের প্রয়োজনেই শাসনসংস্কারের জন্যে 'ভারত সরকার আইন, ১৯১৯' পাস করা হয়। এর ফলে আটটি স্বায়ত্তশাসিত প্রাদেশিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজ্যগুলির আর্থনীতিক দায়িত্ব এড়াবার জন্যেই এই বন্দোবস্ত করা হয়েছিল।

প্রদেশসমূহের সরকার দ্বৈত শাসন নীতির ভিত্তিতে গঠিত হয় এবং ভারতীয় মন্ত্রীদের হাতে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন, স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রশাসন প্রভৃতি সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি ছিল। অপরদিকে ব্রিটিশ সরকারের হাতে মূল বিভাগগুলি সংরক্ষিত ছিল। নির্বাচনের ক্ষেত্রগুলোও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভাগ করা হয়েছিল। ভারত সরকারের ক্ষেত্রেও নতুন ব্যবস্থা একই রকম আপত্তিকর ছিল। সর্বজনীন ভোটাধিকার ছিল না, কেবল সম্পত্তিবান্‌দেরই এই অধিকার দেওয়া হয়েছিল।[১০] সংস্কার আইনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের অমৃতসর অধিবেশনে (১৯১৯) প্রবল মতবিরোধ উপস্থিত হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এই সংস্কারকে বর্জন করার জন্যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। গান্ধীজী এর ঠিক বিপরীত ভূমিকা নেন এবং বলেন 'এই শাসনসংস্কার হল ভারতের প্রতি ব্রিটিশ জনগণের ন্যায় বিচার করার প্রবল সদিচ্ছাজাত।' টিলক মধ্য পন্থা গ্রহণ করেন এবং পরিশেষে দেশবন্ধুকে আপোষ করতে হয়।[১০]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতের সর্বাত্মক সহযোগিতার প্রতিদানে মণ্টেগু-চেমস-

ফোর্ডের সংস্কার আইনেরও আগে যুদ্ধ থামার অব্যবহিত পরেই সর্বপ্রথম চূড়ান্ত দমনমূলক রাওলাট আইন পাস হয় ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে। তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ডের নির্দেশে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড দমনের জন্যে আইন প্রণয়ণ সুপারিশের উদ্দেশ্যে রাওলাটের নেতৃত্বে যে কমিশন গঠিত হয় তারই পরামর্শক্রমে কুখ্যাত দমনমূলক 'নৈরাজ্যবাদী এবং বিপ্লবী অপরাধ আইন, ১৯১৯' (Anarchical and Revolutionary Crimes Act, 1919) জারি হয়। এই আইন বলে নাগরিক স্বাধীনতা চূড়ান্তভাবে সংকুচিত করা হয়। রাওলাট আইনের প্রতিবাদে গান্ধীজীর নেতৃত্বে সারা দেশে যে আন্দোলন শুরু হয় তারই অংশ হিসেবে অমৃতসরে ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল জালিয়ান-ওয়ালাবাগের সভাক্ষেত্রে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে নিরস্ত্র জনগণকে আচমকা যেভাবে হত্যা করা হয় তাতে এক হাজারেরও অনেক বেশী মানুষ ঘটনাস্থলেই নিহত এবং আরও অনেকে পরে মারা যান।[১২] জালিয়ানওয়ালা-বাগের গণহত্যার পরে শৃঙ্খলা বজায় রাখার অজুহাতে সমগ্র পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারি করে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়।

ইতোমধ্যে তুরস্কের সুলতানকে পদচ্যুত করার জন্যে ভারতীয় মুসলমানদের ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে জমা হয়েছিল তাই খিলাফত আন্দোলন নামে ১৯২০ সালে আত্মপ্রকাশ করে। গান্ধীজী এই আন্দোলনকে হিন্দু মুসলমান ঐক্য সৃষ্টির কাজে লাগান এবং সৌকত আলী ও মহম্মদ আলীর সহায়তায় এই আন্দোলনের মুখ্য নেতা হয়ে ওঠেন। এই আন্দোলনে তিলক এবং অন্যান্য নেতাদের[১৩] সমর্থন ছিল না, কিন্তু গান্ধীজীর অধ্যবসায় ও কৌশলে অবশেষে (৬ সেপ্টেম্বর ১৯২০) কংগ্রেস বিশেষ অধিবেশনে সারা ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯৩০-৩১ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের আগে পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনের মত ব্যাপক সর্বভারতীয় গণ আন্দোলন আর গড়ে ওঠেনি। কিন্তু উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরা গ্রামে পুলিশ ও গ্রামবাসীদের সংঘর্ষের ফলে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বারদোলিতে ১৯২২ সালের ১১-১২ ফেব্রুয়ারিতে গান্ধীজীর প্রস্তাবক্রমে গণ অসহযোগ আন্দোলনের বিরতি ঘটাবার সিদ্ধান্ত নেয়। দিল্লীতে ২৪-২৫ ফেব্রুয়ারী সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় তা অনুমোদিত হয়। এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের বহু নেতা ও কর্মীর মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়।[১৪] অসহযোগ আন্দোলনের সাময়িক বিরতির পর কংগ্রেস সংগঠনেও

চিত্র দিয়ে বলেছিলেন যে, ব্রিটেনে এক লক্ষ লোক বেকার ভাতায় জীবন যাপন করে, ভারত স্বাধীন হলে অন্তত আরও ২০ লক্ষ লোক বেকার হয়ে যাবে।[৭] এমনকি ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণীও ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ফলে এত বেশী লাভবান্ হয় যে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেও ঔপনিবেশিক শোষণের একান্ত অনুরাগী একটা বিরাট অংশ ছিল—ব্রিটেনের শ্রমিক আন্দোলন যার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[৮] অপরদিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং ইওরোপের রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক ভারসাম্যের ক্ষেত্রে ব্রিটেনের যে ঘাটতি পড়ত কেবল ভারতে ব্রিটিশ পণ্য রপ্তানি করে সেই ঘাটতির দুই-পঞ্চমাংশ মেটানো হত।[৯]

ব্রিটেনের উন্নতির সবচেয়ে বড় উৎস ছিল ভারত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত তার আর্থনীতিক, প্রশাসনিক এবং রাজনীতিক অবস্থাটা সংক্ষেপে একবার দেখা যাক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে এবং অব্যবহিত পরে ১৯১৬-১৭, ১৯১৭-১৮ এবং ১৯১৮-১৯ সালে ভারত সরকার অবিশ্বাস্য হারে কর-ভার বৃদ্ধি করে। তিন বছরে এই বৃদ্ধির মোট পরিমাণ ছিল ৪০ শতাংশ। ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ সরকারের প্রয়োজনেই শাসনসংস্কারের জন্যে 'ভারত সরকার আইন, ১৯১৯' পাশ করা হয়। এর ফলে আটটি স্বায়ত্তশাসিত প্রাদেশিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজ্যগুলির আর্থনীতিক দায়িত্ব এড়াবার জন্যেই এই বন্দোবস্ত করা হয়েছিল।

প্রদেশসমূহের সরকার দ্বৈত শাসন নীতির ভিত্তিতে গঠিত হয় এবং ভারতীয় মন্ত্রীদের হাতে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন, স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রশাসন প্রভৃতি সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি ছিল। অপরদিকে ব্রিটিশ সরকারের হাতে মূল বিভাগগুলি সংরক্ষিত ছিল। নির্বাচনের কেন্দ্রগুলোও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভাগ করা হয়েছিল। ভারত সরকারের ক্ষেত্রেও নতুন ব্যবস্থা একই রকম আপত্তিকর ছিল। সর্বজনীন ভোটাধিকার ছিল না, কেবল সম্পত্তিবান্-দেরই এই অধিকার দেওয়া হয়েছিল।[১০] সংস্কার আইনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের অমৃতসর অধিবেশনে (১৯১৯) প্রবল মতবিরোধ উপস্থিত হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এই সংস্কারকে বর্জন করার জন্যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। গান্ধীজী এর ঠিক বিপরীত ভূমিকা নেন এবং বলেন 'এই শাসনসংস্কার হল ভারতের প্রতি ব্রিটিশ জনগণের ন্যায় বিচার করার প্রবল সদিচ্ছাজাত।' টিলক মধ্য পন্থা গ্রহণ করেন এবং পরিশেষে দেশবন্ধুকে অপেক্ষা করতে হয়।[১১]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতের সর্বাত্মক সহযোগিতার প্রতিদানে মণ্টেগু-চেমস-

ফোর্ডের সংস্কার আইনেরও আগে যুদ্ধ থামার অব্যবহিত পরেই সর্বপ্রথম চূড়ান্ত দমনমূলক রাওলাট আইন পাস হয় ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে। তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ডের নির্দেশে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড দমনের জন্যে আইন প্রণয়ন সুপারিশের উদ্দেশ্যে রাওলাটের নেতৃত্বে যে কমিশন গঠিত হয় তারই পরামর্শক্রমে কুখ্যাত দমনমূলক 'নৈরাজ্যবাদী এবং বিপ্লবী অপরাধ আইন, ১৯১৯' (Anarchical and Revolutionary Crimes Act, 1919) জারি হয়। এই আইন বলে নাগরিক স্বাধীনতা চূড়ান্তভাবে সংকুচিত করা হয়। রাওলাট আইনের প্রতিবাদে গান্ধীজীর নেতৃত্বে সারা দেশে যে আন্দোলন শুরু হয় তারই অংশ হিসেবে অমৃতসরে ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল জালিয়ান-ওয়ালাবাগের সভাক্ষেত্রে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে নিরস্ত্র জনগণকে আচমকা যেভাবে হত্যা করা হয় তাতে এক হাজারেরও অনেক বেশী মানুষ ঘটনাস্থলেই নিহত এবং আরও অনেকে পরে মারা যান।[১২] জালিয়ানওয়ালা-বাগের গণহত্যার পরে শৃঙ্খলা বজায় রাখার অজুহাতে সমগ্র পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারি করে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়।

ইতোমধ্যে তুরস্কের সুলতানকে পদচ্যুত করার জন্যে ভারতীয় মুসলমানদের ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে জমা হয়েছিল তাই খিলাফত আন্দোলন নামে ১৯২০ সালে আত্মপ্রকাশ করে। গান্ধীজী এই আন্দোলনকে হিন্দু মুসলমান ঐক্য সৃষ্টির কাজে লাগান এবং সৌকত আলী ও মহম্মদ আলীর সহায়তায় এই আন্দোলনের মুখ্য নেতা হয়ে ওঠেন। এই আন্দোলনে টিলক এবং অন্যান্য নেতাদের[১৩] সমর্থন ছিল না, কিন্তু গান্ধীজীর অধ্যবসায় ও কৌশলে অবশেষে (৪ সেপ্টেম্বর ১৯২০) কংগ্রেস বিশেষ অধিবেশনে সারা ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯৩০–৩১ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের আগে পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনের মত ব্যাপক সর্বভারতীয় গণ আন্দোলন আর গড়ে ওঠেনি। কিন্তু উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরা গ্রামে পুলিস ও গ্রামবাসীদের সংঘর্ষের ফলে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বারদোলিতে ১৯২২ সালের ১১-১২ ফেব্রুয়ারিতে গান্ধীজীর প্রস্তাবক্রমে গণ অসহযোগ আন্দোলনের বিরতি ঘটাবার সিদ্ধান্ত নেয়। দিল্লীতে ২৪-২৫ ফেব্রুয়ারী সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় তা অনুমোদিত হয়। এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের বহু নেতা ও কর্মীর মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়।[১৪] অসহযোগ আন্দোলনের সাময়িক বিরতির পরে কংগ্রেস সংগঠনেও

শাসনসংস্কার আইনের পর্যালোচনার জন্যে ১৯২৭ সালের ৮ নভেম্বর একটি কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এই কমিশন (সাইমন কমিশন নামে খ্যাত) কেবল ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্যদের নিয়ে গঠন করা হয়, কোনো ভারতীয় প্রতিনিধি এতে নেওয়া হয়নি। সাম্প্রদায়িকতাকে উসকানি দিয়ে জাতীয় আন্দোলন ও সংহতিতে ভাঙন ধরানোই ছিল শাসন সংস্কার পর্যালোচনার লক্ষ্য। জাতীয় কংগ্রেস সাইমন কমিশনকে পুরোপুরি বর্জন করে এবং তার বিরুদ্ধে সারা ভারতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় এবং নানা জায়গায় হরতাল পালন করা হয় (ফেব্রুয়ারি ১৯২৮)। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন হয়। এখানে গান্ধীজী মতিলাল নেহরু কমিটি প্রস্তাবিত স্বায়ত্ত শাসনের সপক্ষে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বামপন্থী ও বিপ্লবীরা সুভাষচন্দ্র ও জওহরলালের নেতৃত্বে এর বিরোধিতা করে পূর্ণ স্বাধীনতার সংশোধনী প্রস্তাব আনবার চেষ্টা করেন। নেহরু পরে তাঁর সংশোধনী প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেন এবং সুভাষচন্দ্রের আনা প্রস্তাব ১৩৫০-৯৭৩ ভোটে বাতিল হয়ে যায়।[১১] ইতোমধ্যে কংগ্রেসের প্রচেষ্টায় ঐ বছরে সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় খসড়া তৈরির জন্যে যে সর্বদলীয় সম্মেলন ও কমিটি গঠন করা হয়, জিন্নাদের মতো মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দাবির জন্যে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কলকাতা কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত না হলেও পরের বছর ১৯২৯ সালে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় ও আইন অমান্য আন্দোলনের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়। গান্ধীজীর নেতৃত্বে ১৯৩০ সালের ১২ মার্চ ডাণ্ডী অভিযানের মাধ্যমে ঐতিহাসিক লবণ আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। ১৯২১ সালের আন্দোলনের তুলনায় এই আন্দোলনে জনগণের অংশগ্রহণ অনেক বেশী ব্যাপক হয়েছিল এবং শ্রমিক ও কৃষকরা শুধু বেশী সংখ্যায় অংশগ্রহণই করেনি, তাদের শ্রেণী সংগঠনগুলিও অনেক মজবুত হয়ে উঠেছিল।[১২] কিন্তু ১৯২১ সালের আন্দোলনের মত এই আন্দোলনও সফল হবার অনেক আগেই (অর্থাৎ, পূর্ণ স্বাধীনতালাভের আগে) গান্ধীজী সরকারের সঙ্গে আপস করেন এবং গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় (৫ মার্চ ১৯৩১)। কংগ্রেসের প্রতিবাদী নেতাদের মধ্যে জওহরলাল তাঁর আপত্তি সত্ত্বেও গান্ধীর সিদ্ধান্ত মেনে নেন, কিন্তু সুভাষচন্দ্র এর বিরুদ্ধে সমস্ত সম্ভাব্য সাংগঠনিক পদ্ধতিতে তীব্র প্রতিবাদ করেন। কংগ্রেসের মূল সংগঠনগুলি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং ১৯৩৩

সালের ৯ মে ভিয়েনা থেকে ভি. জে. প্যাটেল ও সুভাষচন্দ্র বসু যুগ্ম ইস্তাহারে 'ব্যর্থ গান্ধীনেতৃত্বের পরিবর্তে আপসবিহীন সংগ্রাম পরিচালনার জন্যে কংগ্রেসের ভিতরে নতুন দল গঠনের আহ্বান জানান।[১৮] ১৯৩৪ সালের মে মাসে পাটনায় একটি সম্মেলনের মাধ্যমে 'কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল' বা Congress Socialist Party (CSP) প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন নরেন্দ্র দেব। এই দলের অন্যতম নেতা সম্পূর্ণানন্দ সম্মেলনের আগে সমাজতন্ত্রী কর্মসূচীর খসড়া দলিল রচনা করেন। ইনি ছাড়াও তখন এই দলের প্রতিষ্ঠাতা নেতা হিসাবে জয়প্রকাশ নারায়ণ, অচ্যুত পটবর্ধন, ইউসুফ মেহেরআলী, অশোক মেহতা, মিনু মাসানী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথম থেকেই এই দলে বামপন্থী জাতীয়তাবাদী থেকে মার্কসবাদী পর্যন্ত বিভিন্ন মতাদর্শের কর্মীরা ছিলেন। কংগ্রেসের মধ্যে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেও এই দল কংগ্রেস নেতৃত্বের সমর্থক ছিল না। অপরদিকে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতারাও এই দল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারকে সুনজরে দেখেননি। এদিকে কংগ্রেসের ফৈজপুর সম্মেলনে (১৯৩৬) নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মোট ১১টি প্রদেশে ১৫৮৫টি কেন্দ্রে নির্বাচন হয়। কংগ্রেস ৭১৫টি আসন পায় ও ৭টি প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এর মধ্যে কংগ্রেস একাই মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ (বর্তমানে উত্তর প্রদেশ), বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আইনসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং পরে সিন্ধু ও আসামে কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। সমাজতান্ত্রিক ও বামপন্থী মহলে কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের বিরুদ্ধে অসন্তোষের গুঞ্জরণ শোনা গেল।[১৯]

প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন যে ধারা পাশাপাশি চলছিল তা হল গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের একটা নতুন পর্যায়। এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা বর্তমান পুস্তকের পরিসরে প্রাসঙ্গিক নয়। সংক্ষেপে একথা বলা যায় যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রাসবিহারী বসু, লালা হরদয়াল, কর্তার সিং, পিংলে প্রমুখের নেতৃত্বে এবং গদর, যুগান্তর, অনুশীলন প্রভৃতি বিপ্লবী সংগঠনের মাধ্যমে জার্মানী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা প্রভৃতি দেশের প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের সহায়তায় ভারতে যে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোর চেষ্টা হয়েছিল তা ব্যর্থ হয়। এর পরে ১৯৩০ সালের ১৮-২২ এপ্রিল 'মাস্টারদা' সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এবং জালালাবাদ পাহাড়ে 'ইণ্ডিয়ান

তাঁরা রাজনীতিতে অংশ নিতে পারবেন না বা ঐ সব ভবিষ্যতে কখনো নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না।

সাম্রাজ্যবাদকে কায়েম রাখার উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণভাবে এই প্রস্তাব যোগ করা হয় সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে। ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের হোম মেম্বার স্যর রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েল ভাইসরয়ের কাছে প্রস্তাব পাঠান যে শুধু কংগ্রেসকে দুর্বল করে সরকারের আরোপিত শর্তাবলী মানতে বাধ্য করলেই যথেষ্ট হবে না বরং 'একটা রাজনৈতিক দল হিসাবে কংগ্রেসকে ধ্বংস করে দিতে হবে'।[১০] সরকার যে পরিকল্পনা করে তার অন্তর্ভুক্ত ছিল কংগ্রেস নেতাদের পাইকারী গ্রেপ্তার, যে সব সরকারী কর্মচারীকে উচ্চ এবং নিম্নপদস্থ রাজভক্ত বলে মনে হবে না, তাদের গ্রেপ্তার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া এবং কংগ্রেসের সমস্ত দলীয় কার্যালয় এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া ইত্যাদি। অপর দিকে ঐ অর্ডিন্যান্স সরকারের হাতে যে সব ব্যাপক ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয় এক কথায় বলা যেতে পারে সেটা হল 'শান্তি রক্ষার নামে যা খুশি করার ক্ষমতা'।

'বিপ্লবী আন্দোলন অর্ডিন্যান্স' নামকরণ নিয়ে খোদ সরকারী মহলে প্রথমে অনেক চিন্তাভাবনা করা হয়, 'কারণ এই অর্ডিন্যান্সের ফলে আমেরিকায় বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে এবং জার্মানরাও তাদের নিজেদের প্রচারে এর ফলে লাভবান হতে পারে।' নানা চিন্তাভাবনার পরে শেষ অবধি ঠিক হয় অর্ডিন্যান্সের সংক্ষিপ্ত নাম হবে, 'জরুরী ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স' Emergency Power Ordinance। এবং বিদেশে এই নামই প্রচার করা হবে।[১১] কিন্তু বহু আমলাই এই অর্ডিন্যান্স জারির বিপক্ষে ছিলেন। উত্তর প্রদেশের গভর্নর স্যর মরিস হ্যালেট ভারত রক্ষা আইন দিয়েই যুদ্ধের সময়ে কংগ্রেসের মোকাবিলা করার আগ্রহী ছিলেন। তাঁর মতে এই 'অর্ডিন্যান্স প্রশাসনিক দিক থেকে অপ্রয়োজনীয় এবং বিভ্রান্তিকর আর রাজনৈতিক দিক থেকে একটা ভুল।' কারণ হিসাবে তিনি বলেন 'যদি আমরা দেশের একটা রাজনৈতিক দল হিসেবে কংগ্রেসকে নিশ্চিহ্ন করতে চাই, তাহলে কংগ্রেসের যারা আংশিক সমর্থক তাদেরকে কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। কংগ্রেসকে ধ্বংস করবার ইচ্ছে সম্পর্কে আমার কিছুই বলার নেই, কিন্তু আমি শুধু বলতে চাই যে এটা তার পথ নয়। ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান, কিছু রক্ষাকবচ থাকলেও, ভারতীয়রা নিজেরাই নির্ধারণ করবে—একথা বলার পরে একমাত্র যুদ্ধের কাজে বাধা

মৌলানা ক্রিপসকে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে ভারতের স্বাধীনতার দাবি ব্রিটিশ সরকার মেনে নিলে যুদ্ধে ব্রিটেনের সঙ্গে সহযোগিতা সংক্রান্ত তাঁর প্রস্তাবকেই জনগণ গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গীর থেকে বেশী গুরুত্ব দেবে। শুধু তাই নয়, গান্ধীজীর প্রতি সকলের অগাধ শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বড় অংশ যে গান্ধীজীর বদলে তাঁকেই মেনে নেবেন এতেও মৌলানার কোনো সন্দেহ ছিল না।[৪০] মনে হয় কংগ্রেসের মধ্যে রাজাগোপালাচারী প্রমুখ নরমপন্থী নেতারা আপসের পক্ষে থাকলেও আজাদ প্রধানত আন্তর্জাতিকতাবাদ ও গণতন্ত্রের প্রবক্তা ফ্যাসিবিরোধী জওহরলাল নেহরুর সমর্থনের উপরে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাছাড়া, কংগ্রেস থেকে সুভাষচন্দ্রের বিতাড়ন ঘটার পরে জওহরলালই ছিলেন সবচেয়ে তরুণ, জনপ্রিয় ও বামপন্থী ও প্রগতিশীল ভাবমূর্তির অধিকারী।

এই আলোচনার পরে স্যর স্ট্যাফোর্ড একটি স্মারকলিপি (aide memoire) তৈরি করেন। এতে বলা হয় ব্রিটিশ সরকার অবিলম্বে এই মর্মে একটি প্রতিশ্রুতি দেবেন যে যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করা হবে। এ কথাও ঘোষণা করা হবে যে ভারত ভবিষ্যতে কমনওয়েলথভুক্ত থাকবে কিনা সে সম্পর্কে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারও একমাত্র ভারতেরই থাকবে। যুদ্ধ চলাকালে ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যদের মন্ত্রীর সমান মর্যাদা হবে। ভাইসরয় নিছক নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে থাকবেন। এইভাবেই কার্যত ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে, আইনগত হস্তান্তর যুদ্ধের পরে হবে।[৪১] ক্রিপস-প্রস্তাবিত আপসের সূত্র ওই যুদ্ধকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী যে খুশী মনে মেনে নিয়েছিলেন তা মনে হয় না। তবুও প্রধানত মার্কিন চাপে ১৯৪২ সালের ১১ মার্চ ভারতে ক্রিপস মিশন পাঠাবার কথা ঘোষণা করা হয়। ভারতে ক্রিপস মিশনের আগমনকে কেন্দ্র করে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। একদিকে কংগ্রেস, লীগ প্রভৃতি দলগুলো পুরনো বন্ধুকে স্বাগত জানাতে উৎসুক ছিলেন, অপর দিকে বামপন্থীরা সাধারণভাবে ছিলেন এই মিশনের বিরুদ্ধে। সুভাষচন্দ্র বসুও জার্মানী থেকে বেতার ভাষণে ভারতবাসীকে এই টোপ গেলার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেন। ক্রিপস যে পুরনো বন্ধুত্বকেই কাজে লাগাতে আসছেন এ ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলেন।[৪২]

কমিটিকে মুসলিম লীগের ভারত বিভাগের দাবি মেনে নিয়ে জাতীয় সরকার গঠনে সচেষ্ট হতে অনুরোধ করা হয়। এর ফলে কংগ্রেস মহলে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে মৌলানা আজাদ রাজাগোপালাচারীকে প্রস্তাবগুলি প্রত্যাহার করে নিতে বলেন। রাজাগোপালাচারী তাতে অসম্মত হন এবং সেই কারণে ৩০ এপ্রিল ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমদিকে যদিও দলের পক্ষ থেকে এ কথা বলা হয় যে সম্মানজনক শর্তে স্বীকৃত হলে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপস আলোচনায় আপত্তি নেই, কিন্তু ঐ বছরের অক্টোবর-নভেম্বর মাস থেকে ফরওয়ার্ড ব্লক তার আপসবিরোধী সংগ্রামের প্রচার জোরদার করে তোলে।

(৫) বামপন্থীদের মধ্যে সংহতি গড়ে তোলার প্রয়োজনে ১৯৩৯ সালে ফরওয়ার্ড ব্লকের এবং অন্যান্য দলের উদ্যোগে বোম্বাইয়ে বামপন্থী সংহতি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে একটি সংযুক্ত এবং সুসংগঠিত ফ্রন্ট হিসেবে উপস্থিত হতে পেরেছিল। এবং নাগপুরে এই বছরের অক্টোবর মাসে এই কমিটির উদ্যোগে একটি সকল আপসবিরোধী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এর অব্যবহিত পরেই ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির যে বৈঠক বসে সুভাষচন্দ্রকে ঐ সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়। ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষে তাঁর বক্তব্য ছিল যে তৎক্ষণাৎ সংগ্রাম শুরু করে দেওয়া উচিত। এই কথা তিনি পরিষ্কারভাবে জানান যে ওয়ার্কিং কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে ফরওয়ার্ড ব্লক মনে করে দেশের প্রকৃত স্বার্থে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার তার আছে।[৬]

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের আপসপন্থী মনোভাবের বিরুদ্ধে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রচারের চূড়ান্ত পর্বে এই নেতৃত্বের অপসারণের দাবি জানায় এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পরিবর্তে একটি বামপন্থী কংগ্রেস গঠনের প্রস্তাব দেয়। একই সঙ্গে সুভাষচন্দ্র পুরো কংগ্রেসকে সঙ্গে না পেলে তাকে বাদ দিয়েই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আপসহীন সংগ্রাম শুরু করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন।[৭] কংগ্রেস তখন আন্দোলন শুরু না করার সপক্ষে যে যুক্তি দেখাচ্ছিল—জনগণ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত নয়, দেশে হিংসা এবং সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব রয়েছে ইত্যাদি—ফরওয়ার্ড ব্লকের মতে তার মূল কারণ ছিল কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের দেউলিয়াপনা এবং সংগ্রাম শুরু হলে নেতৃত্ব হারাবার ভয়।[৮]

ফরওয়ার্ড ব্লকের আরও অভিযোগ ছিল যে ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারের থেকেও কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের বৈরিতা এই দলকে আরও অসুবিধায় ফেলেছে।[৯]

সুভাষচন্দ্রের এই সময়কার বক্তব্য থেকে একথা কখনও কখনও মনে হয় যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের থেকেও কংগ্রেস নেতৃত্ব বিপ্লবী বামপন্থী জাতীয়তাবাদীদের কাছে আরও বড় শত্রু ছিলেন।[১০] কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে যে গণ-পরিষদ বা সংবিধান সভা আহ্বানের দাবি জানানো হয়েছিল

সমালোচনা করে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্রে তাকে 'পাতি-বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠন' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এর পরেই দুটি দলের মধ্যে সম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতি ঘটে।[১৮]

এর পর ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষ থেকে একটি আপসবিরোধী কমিটি গঠন করা হয় এবং ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে বিহারের রামগড়ে কংগ্রেস অধিবেশনের পাশাপাশি একটি আপসবিরোধী সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এই সম্মেলনে ফরওয়ার্ড ব্লক ছাড়াও নিখিল ভারত কিষাণ সভা যোগ দেয়। কিষাণ সভার জনপ্রিয় নেতা স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী সম্মেলনে একটি বিশাল কৃষক সমাবেশের আয়োজন করেন। বাস্তব ক্ষেত্রে কংগ্রেস অধিবেশনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার দিক থেকে এই আপসবিরোধী সম্মেলন যথেষ্ট সফল হয়েছিল। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি ও কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি এই সম্মেলনে যোগ দেয়নি। এই সম্মেলনের মঞ্চ থেকে সুভাষচন্দ্র সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম শুরু করার আহ্বান জানান। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব নতুন করে চরকা, গঠনমূলক কর্মসূচী, দলীয় শৃঙ্খলা প্রভৃতির উপর যে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন সুভাষচন্দ্র তার কঠোর সমালোচনা করেন। এই সম্মেলনে সংগ্রামকে পর্যায়ে নিয়ে যাবার জন্য একটি জাতীয় কর্মপরিষদ গঠন করা হয়।

অপরদিকে ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষ থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম আবার শুরু করার জন্য অন্যান্য দলকেও বোঝাবার চেষ্টা করা হয়। উদাহরণ হিসেবে মুসলিম লীগ এবং হিন্দু মহাসভার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। লীগ নেতা জিন্না সেই সময়ে ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় ভারত বিভাগ তথা পাকিস্তান হাসিল করার পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করতে উৎসাহী ছিলেন। ফলে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রস্তাব নিয়ে লীগের সঙ্গে আলোচনায় ব্লক সফল হতে পারে নি। এদিকে হিন্দু মহাসভাও ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে যুদ্ধে সহযোগিতা করার নীতি গ্রহণ করে। কারণ, ঐ দল এইভাবে হিন্দুদের ব্রিটিশ সৈন্যদলে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহী ছিল। হিন্দুদের পক্ষে সামরিক শিক্ষালাভ করাকে দলের নেতারা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলেন। ফলে হিন্দু মহাসভার দিক থেকেও ব্লক হতাশ হয়েছিল।[১৯]

রামগড়ে আপসবিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠানের পর থেকেই ফরওয়ার্ড ব্লকের বিরুদ্ধে কঠোর সরকারী দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এবং এই দলের বহু বিশিষ্ট

নেতাকে গ্রেপ্তার করা হতে থাকে। দেশজোড়া এই দমনের মুখে দাঁড়িয়ে ফরওয়ার্ড ব্লকও সংগ্রাম জোরদার করে। এই বছরের ৬ থেকে ১৩ এপ্রিল ফরওয়ার্ড ব্লক দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলনের মাধ্যমে জাতীয় সপ্তাহ পালন করে। এর মধ্যে ১৯৪০ সালের জুন মাসে নাগপুরে ফরওয়ার্ড ব্লকের দ্বিতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অপরদিকে সরকারী দমন ব্যবস্থার চূড়ান্ত পর্যায়ে দলের সভাপতি সুভাষচন্দ্রকে ঐ বছরের জুলাই মাসের শুরুতে কারারুদ্ধ করা হয়। তিনি মুক্তির দাবিতে আমরণ অনশন শুরু করেন এবং তাঁর শারীরিক অবস্থা সাতদিন অনশনের পরে আশঙ্কাজনক হয়ে উঠলে তাঁকে কলকাতায় স্বগৃহে অন্তরীণ করে রাখা হয়। এই অবস্থায় কড়া পুলিশ পাহারায় চল্লিশ দিন কাটানোর পরে তিনি ১৯৪১ সালের ১৭ জানুয়ারি মধ্যরাতে গোপনে গৃহত্যাগ করতে সমর্থ হন। ব্রিটিশ পুলিশবাহিনী বহু চেষ্টাতেও তাঁকে ধরতে পারেনি, এবং দুঃসাহসিকভাবে তিনি কাবুল হয়ে ইটালীর পথে জার্মানি পৌঁছান। তাঁর পরবর্তী কার্যক্রম 'আজাদ হিন্দ আন্দোলন' অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। নেতার অন্তর্ধানের সময়ে ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মীরা ভারতের বাইরে তাঁর কর্মসূচীর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন এবং ১৯৪২ সালের আগস্ট সংগ্রামে যোগ দেন। দলের অধিকাংশ কর্মী ও নেতাই যুদ্ধ চলাকালীন [illegible] কারারুদ্ধ ছিলেন।

যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ফরওয়ার্ড ব্লকের ভূমিকা ছিল কেবল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। সামাজিক মতাদর্শগত দিক থেকে ব্লক কোনো সময়েই একটি সমচিন্তা-বিশিষ্ট সংগঠন ছিল না এবং স্পষ্টভাবে এর কোনো মতাদর্শগত তত্ত্বও প্রস্তুত করা হয়নি।

সূচনাপর্বে ফরওয়ার্ড ব্লক একটি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মঞ্চ হওয়াতেই এটা সম্ভবপর হয়েছিল। অপরদিকে সুভাষচন্দ্র সাম্রাজ্যবাদের যুগে তার বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম করাকেই বামপন্থা হিসেবে চিহ্নিত করায় প্রারম্ভিক পর্যায়ে মতাদর্শগত বিভাজন দেখা দেয়নি। ঐতিহাসিক দিক থেকে বলা চলে সাম্রাজ্যবাদের পাশাপাশি কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামী মনোভাব ঐ দলের কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ রাখতে সহায়তা করেছিল।[১২]

কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৪১ সালের ২২ জুন হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করার আগে পর্যন্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির মতোই এই যুদ্ধকে 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ' হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। সেই

কংগ্রেসের নেতৃত্ব যে এই ধর্মঘটগুলিকে সমর্থন জানায়নি এজন্যে তাঁদের নিন্দা করা হয়।[১৯]

কংগ্রেসের মধ্যে কার্যরত বামপন্থী দলগুলির মধ্যে শুধু যে ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গেই কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধ এবং বিচ্ছেদ ঘটে তা নয়, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির সঙ্গেও এই দলের সম্পর্কের একই পরিণতি ঘটে। এই দলের সঙ্গে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির মতপার্থক্য এবং বিরোধকে প্রধানত তিনটি দিক থেকে দেখা যেতে পারে। প্রথমত, কমিউনিস্টরা কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিকে একটা গণ দলে (mass party) পরিণত করার পক্ষে চাপ দিতে থাকে। কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য অনুযায়ী কংগ্রেসের ঐক্য রক্ষা করে তার মধ্যে থেকে সংগ্রাম করার জন্যে সংযুক্ত মার্কসবাদী দল গঠন অপরিহার্য। এই দল গঠনের পূর্ব শর্ত তাঁদের মতে ছিল সি এস পি-কে গণ দলে রূপান্তরকরণ। দ্বিতীয়ত, জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী শ্রেণী হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীকে কমিউনিস্ট পার্টি চিহ্নিত করেছেন। অপরদিকে সি. এস. পি-র তত্ত্ব অনুযায়ী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরাই এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে পারে। তৃতীয়ত, কমিউনিস্টরা বিশ্বাস করতেন যে জাতীয় সংগ্রাম জাতীয় বিপ্লব তথা স্বাধীনতা লাভেই শেষ হবে না, সংগ্রাম চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে অবিচ্ছিন্নভাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যের অভিমুখে। অপর দিকে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীরা দুটি প্রশ্নকে একসঙ্গে বিচার করতে প্রস্তুত ছিলেন না, তাঁদের মতে সমাজতন্ত্রের প্রশ্ন কেবল স্বাধীন ভারতেই উঠতে পারে, পরাধীন ভারতে বিপ্লবের একমাত্র লক্ষ্য জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন।[২০]

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির এই সময়কার বক্তব্য ও আচরণে একটা পরস্পর বিরোধ লক্ষ করা যায়। পরবর্তীকালে, অর্থাৎ আগস্ট সংগ্রামের সময়ে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ প্রচেষ্টার সমর্থক হয়ে ওঠে এবং জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বিরোধিতা করতে থাকে, তার সঙ্গে এই পরস্পর বিরোধ ও অসংগতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত "কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি অ্যাণ্ড দি ওয়ার" নামক পুস্তিকায় একদিকে ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ভারতীয় জনগণের দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীবাদ যে তার সর্বশেষ এবং সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল স্তরে প্রবেশ করেছে—একথা কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে বলা হয়। যুদ্ধ সহযোগিতার প্রশ্নে আপসমুখী

মনোভাবই হল জাতীয় সংগ্রামের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিপজ্জনক এবং গান্ধীবাদ সেই আপসের নীতি — এ কথা ঐ পুস্তিকায় বলা হয়। পাশাপাশি একই সঙ্গে বলা হয় যে এসব সত্ত্বেও গান্ধীবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত কংগ্রেসকে ত্যাগ করা যাবে না। বরং তার মধ্যে থেকে আদর্শগত সংগ্রাম চালাতে হবে। কিন্তু কার্যত এই সংগ্রাম চালাবার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং কার্যত নেতৃত্বের সঙ্গে আপসের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এরকম একটি উদাহরণ হল কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক বিনা প্রতিবাদে পূর্বঘোষিত স্বাধীনতা দিবসের অঙ্গীকার গ্রহণের ঘটনা। কংগ্রেসের বদলে গঠনমূলক কর্মসূচীর শপথ এবং গান্ধীবাদী নীতি ও আদর্শের প্রতি আনুগত্য ব্যক্ত থাকায় প্রতিজ্ঞা এই অঙ্গীকার-পত্রে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অন্তর্ভুক্ত করে ছিলেন। এটি গ্রহণ করার জন্যে কর্মীদের উপরে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করা হয় ও কংগ্রেস সোশ্যালিস্টরা এটি গ্রহণে অসম্মতি জানান।[২১]

দল বেআইনী থাকায় ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাস থেকে গোপন পার্টি সংগঠনের মাধ্যমে কাজ চালানো হতে থাকে, কিন্তু প্রাদেশিক স্তরে পার্টি ভাল গোপন সংগঠন গড়ে তুলতে পারেনি। যুদ্ধের গতি পরিবর্তনের আগে পর্যন্ত পার্টির বহু কর্মীকেই কয়েক বছর কারাবাস করতে হয়েছে, পরে পর্যায়ক্রমে তাঁরা মুক্তি পান।

কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি : সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতে বামপন্থীদের একটি গোষ্ঠী হিসেবে ১৯৩৪ সালে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি বা সি. এস. পি.-র প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই এই দল দু ধরনের দ্বন্দ্বের শিকারে পরিণত হয়। একদিকে আদর্শবাদ ও বাস্তববোধের দ্বন্দ্ব, অপরদিকে মার্কসবাদ ও গান্ধীবাদের দ্বন্দ্ব। পরবর্তীকালে, বিশেষ করে বিশ্বযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে, এই দ্বন্দ্ব দলের বক্তব্যকেই শুধু অস্পষ্ট করেনি—দলের জনপ্রিয়তা ও সংগঠনেরও যথেষ্ট ক্ষতি করে।

১৯৩৪ সালে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত দলের প্রথম জাতীয় সম্মেলনে এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সক্রিয় বিরোধিতা করা হবে এবং জাতীয় সংগ্রাম তীব্রতর করে তোলার কাজে এই ধরনের ব্যবস্থার সংকটের সুযোগকে ব্যবহার করা হবে। যুদ্ধের প্রথম থেকেই এই যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হিসেবে দলের পক্ষ থেকে চিহ্নিত করা হয়। সেই সঙ্গে এই যুদ্ধকে প্রতিরোধ করার কর্মসূচীও নেওয়া হয়। দলের যে জোরাল যুদ্ধের

রোধই করবে। আমরা সেই কর্মসূচীকে প্রভাবিত করতে পারি, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না।" আচার্য নরেন্দ্র দেব প্রমুখ অন্যান্যদেরও একই রকম ধারণা ছিল।

শক্তির অবস্থা সম্পর্কে খানিকটা অসহায়তা বোধ থেকেই দলের অনেকগুলি মৌল ধারণা সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দেয়। এঁরা মনে করতেন, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং কিষাণ সভার ভূমিকা হবে সহায়তাকারীর ভূমিকা।

সি.এস.পি প্রথমে তাত্ত্বিকভাবে মার্কসবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকলেও পরে ক্রমেই বাস্তব রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গান্ধীবাদী প্রভাবের দ্বারা আকৃষ্ট হচ্ছিল। এল পি সিনহার ভাষায় "সমাজতন্ত্রীরা এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে আটক হয়ে পড়েছিলেন যেখানে তাঁদের হৃদয় ছিল গান্ধীর সঙ্গে আর মস্তিষ্ক ছিল মার্কসের সঙ্গে, এবং যদিও গান্ধীবাদ ক্রমেই জিতে যাচ্ছিল তবুও মার্কসের হাত কিছুতেই ছাড়তে চাইছিলেন না।" এই দলের নেতারা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের মতই সোভিয়েত ইউনিয়নকে মার্কসবাদের মূর্ত প্রতীক হিসেবে মানতেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্র নীতির অসামঞ্জস্য দেখে তাঁরা ক্রমেই মার্কসবাদের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে পড়ছিলেন।

এই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি সি. এস. পি-কে একটি 'ভ্রাতৃপ্রতিম মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রী দল' হিসেবে উল্লেখ করত এবং দুটি দলের একীকরণের জন্যে চাপ সৃষ্টি করে ও প্রচার চালায়। কিন্তু কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীরা এই প্রস্তাবে রাজী ছিলেন না। ঐক্যবদ্ধ মার্কসবাদী দল গঠনের বদলে তাঁরা ক্রমেই পশ্চিম ইউরোপের ধাঁচে গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক দল গঠনে উৎসাহী হচ্ছিলেন। কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাঁদের বিরোধ দেখা দেয় এবং রামগড় কংগ্রেসের সময়ে ১৯৪০ সালে সি.এস.পি থেকে দলের মধ্যে উপদল গঠনের অভিযোগে কমিউনিস্টদের বহিষ্কার করে দেওয়া হয়। কিন্তু সি.এস.পি-র অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, কেরালা প্রভৃতি প্রাদেশিক শাখাগুলির উপরে কমিউনিস্টদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকায় তাঁরা দল থেকে যাবার সময়ে পুরো প্রাদেশিক শাখাগুলিই সি. এস. পি ছেড়ে বেরিয়ে যায়। এর ফলে কমিউনিস্টদের সঙ্গে বিচ্ছেদের পরে সাময়িকভাবে এই দল কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে।

যুদ্ধের প্রথম পর্বে যুদ্ধবিরোধিতার জন্যে এই দলের অসংখ্য কর্মী ও বহু বিখ্যাত নেতা যেমন জয়প্রকাশ নারায়ণ, রামমনোহর লোহিয়া প্রমুখ অন্যান্য

এইভাবে বামপন্থীদের যুদ্ধ-সংক্রান্ত ইস্তাহারে যে বক্তব্য উপস্থিত করা হয় তার মধ্যে যথেষ্ট জড়তা এবং অস্পষ্টতা থাকলেও তার মাধ্যমে একাধারে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ, ফরওয়ার্ড ব্লক, সি. এস. পি এবং কমিউনিস্ট পার্টির যুদ্ধ সংক্রান্ত বক্তব্য থেকে নিজেদের মতামতের স্বাতন্ত্র্য বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করা হল। কার্যগত ভাবে অবশ্য এই বিশ্লেষণের একটাই অর্থ দাঁড়াল, সেটা হল যুদ্ধপ্রয়াসে সাহায্য করা। একমাত্র অল্প কিছুদিনের জন্যে এর ব্যতিক্রম দেখা গিয়েছিল যখন এই গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে যুদ্ধকে 'সাম্রাজ্যবাদী' হিসেবে চিহ্নিত করে নিরপেক্ষতার নীতি নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই 'নিরপেক্ষতার নীতি' কোনভাবেই যুদ্ধকে প্রতিরোধ করার নীতি ছিল না।

মানবেন্দ্রনাথ জাতীয় কংগ্রেসকে এই বলে সমালোচনা করেছিলেন যে যুদ্ধ চলাকালীন স্বাধীনতার লক্ষ্যের দিকে না তাকিয়ে কংগ্রেসের কর্তব্য হচ্ছে যুদ্ধে সহযোগিতার ভিত্তি খুঁজে বার করা। আলাপ-আলোচনার সুবিধাজনক জায়গায় থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস বাস্তববাদী পথ না নেওয়ায় তিনি কংগ্রেস নেতাদের সমালোচনা করেন। যুদ্ধের পরেও যদি ব্রিটেন ভারতের স্বাধীনতার দাবি মেনে নেয় তাতেই বা ক্ষতি কি? এটাই ছিল তাঁর বক্তব্য। তাঁর আরও একটি বক্তব্য ছিল যে প্রদেশগুলিতে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পদত্যাগ করা উচিত হয়নি, কারণ তারা ক্ষমতায় থাকলে তার মাধ্যমে যুদ্ধের সময়ে নাগরিক স্বাধীনতাকে রক্ষা করে গণতান্ত্রিক শক্তিকে মজবুত করা যেত। মানবেন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল যে কংগ্রেস নেতৃত্ব ক্রমশই গান্ধীবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে এবং যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রশ্নে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে ফ্যাসিবাদের বীজ লুকিয়ে রয়েছে। এই প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য মানবেন্দ্রনাথ রায় ১৯৪০ সালে রামগড় কংগ্রেসে সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। প্রথমে কিছুদিনের জন্য রায় তাঁর অনুগামীদের কংগ্রেসের মধ্যে মিশে থাকার পরামর্শ দিলেও ১৯৪০ সালের শেষ দিকে তিনি নতুন দল প্রতিষ্ঠা করেন। এই দলের নাম হয় 'র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি'।

বামপন্থীরা শুধু যে কার্যক্ষেত্রে যুদ্ধের শুরু থেকে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপস করেন তাই নয়, ইতঃপূর্বে তাঁরা কংগ্রেস-নেতৃত্বের সঙ্গেও আপস করেন। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে বামপন্থী সংহতি কমিটির পক্ষ থেকে ১৯৩৯ সালের জুন মাসে সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির বোম্বাই অধিবেশনে

বামপন্থীদের বিরুদ্ধে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তার প্রতিবাদ দিবস পালনের ব্যবস্থা করা হয় ৯ জুলাই তারিখে। এর পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস সভাপতি এই মর্মে সার্কুলার জারি করেন যে যাঁরা এই প্রতিবাদ দিবসে অংশ নেবেন তাঁদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস নেতৃত্বের পক্ষ থেকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে সংহতি কমিটির অন্যতম শরিক রায়পন্থীরা শেষ মুহূর্তে ঘোষণা করেন যে তাঁরা এই দিবস পালনে সহযোগিতা করবেন না, এবং তাঁরা কমিটির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন।[৪৪]

চতুর্থ অধ্যায়
যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় ও ভারতের রাজনৈতিক দলসমূহের দৃষ্টিভঙ্গী

১৯৪১ সালের ২২ জুন জার্মানী সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের গুণগত চরিত্রগত পরিবর্তন হয়। প্রথমত, এর ফলে ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রপক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন যোগ দেওয়ায় ও যুদ্ধে যোগদানকারী দেশের সংখ্যার এবং প্রকৃতিগত দিক থেকে কিছু পরিবর্তন হয়। দ্বিতীয়ত, এর ফলে ভারত এবং অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক দলগুলি যুদ্ধ সম্পর্কে যে মূল্যায়ন করে ছিল তার পুনর্বিবেচনা শুরু করে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যদিও সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে সহানুভূতি প্রকাশ করলেও যুদ্ধের মূল্যায়ন করতে যথেষ্ট ইতস্তত করেছিল। এর কারণ, আমরা দেখেছি যে কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে যুদ্ধের প্রকৃতি এবং করণীয় বিষয় নিয়ে মতপার্থক্য ছিল।

অপরদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন এই যুদ্ধে যোগ দেবার পরেও কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি নতুন করে কোনো পর্যালোচনা করেনি। এই দলের মতে এই যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই থেকে গেছে — সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার জন্যে যুদ্ধের চরিত্রের কোনো বদল ঘটেনি, অর্থাৎ এই যুদ্ধ জনযুদ্ধ হয়ে ওঠেনি। দলের নেতা আচার্য নরেন্দ্র দেবের মতে কোন যুদ্ধ তখনই জনযুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে যখন কোনো পরাধীন দেশের জনগণ জাতীয় স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করে, অথবা যখন কোনো দেশের জনগণ দেশের সরকার এবং পুঁজিপতিশ্রেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায়, অথবা এমন কোনো যুদ্ধ যা একই সঙ্গে পুঁজিবাদ এবং ফ্যাসিবাদের ধ্বংসের জন্যে চালানো হয়। এর কোনটাই, তাঁর মতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চালিকাশক্তি বা উদ্দেশ্য নয়। ১৯৪১ সালের ৬ ডিসেম্বর সি. এস. পি.-র সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করেন যে ভারতের স্বাধীনতার স্বীকৃতি ব্যতিরেকে এই যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই থেকে যেতে বাধ্য। কাজেই এই দল যুদ্ধবিরোধী প্রচার এবং যুদ্ধের কাজে বাধাদানের কর্মসূচী অব্যাহত রাখে এবং একই সঙ্গে স্বাধীনতার দাবিতে গণ-সংগ্রাম শুরু করার জন্যে কংগ্রেসের কাছে দাবি জানায়। কমিউনিস্ট পার্টির নতুন নেওয়া জনযুদ্ধের নীতিকেও তারা কঠোর সমালোচনা করে।

যুদ্ধের গতি পরিবর্তনের পরেও মাস ছয়েক ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যুদ্ধ সম্পর্কে তার পুরনো মূল্যায়ন বজায় রাখে। আমরা আগেই বলেছি যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উপরে ব্রিটিশ পার্টির যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এই সময়ে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক হ্যারি পলিট নতুন বক্তব্য প্রচার করেন এবং এতে বলা হয় যে এখন থেকে ব্রিটেনের যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সহযোগিতা করা উচিত। কিন্তু ঐ দলের অপর নেতা রজনী পাম দত্ত (ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উপরে যাঁর বিশেষ প্রভাব ছিল) একটি বিবৃতিতে জানান যে যুদ্ধের প্রকৃতিগত কোন পরিবর্তন হয়নি। ফলে, এই সময়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সেখান থেকে অন্য রকম কোনো নির্দেশ না পাওয়ায় পুরনো বক্তব্যই বলতে থাকে। সেই সঙ্গে এই দল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এবং ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরো তীব্র করে তোলার আবেদন জানায়। কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষণা করে যতদিন না ভারতে গণ সরকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততদিনই এই পথ অনুসরণ করা হবে। কেবল স্বাধীন জাতি হিসেবে পরিগণিত হতে পারলেই ভারতের জনগণ সোভিয়েত ইউনিয়নকে বেশী সাহায্য করতে পারবে—দলের পক্ষ থেকে একথা ঘোষণা করা হয়।[২৩]

এর পরে অল্প দিনের জন্য দলের পক্ষ থেকে 'দুই যুদ্ধ' এর তত্ত্ব চালানো হয়। এর অর্থ ছিল পশ্চিম রণাঙ্গনে যে যুদ্ধ চলছে তা হল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ আর পূর্ব রণাঙ্গনের অর্থাৎ জার্মানী এবং সোভিয়েতের মধ্যকার যুদ্ধ হল জনযুদ্ধ। কিন্তু এই তত্ত্ব বেশীদিন চলেনি। দলের পক্ষ থেকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের যে তত্ত্ব তখনও চালানো হচ্ছিল তার সঙ্গে দলের যে নেতারা দেউলী বন্দী নিবাসে আটক ছিলেন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ছিল। এইসব নেতারা বন্দী নিবাসের মধ্যে জনযুদ্ধের তত্ত্বের রূপদান করেছিলেন এবং একই সঙ্গে ভারতের ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধপ্রচেষ্টাতে শর্তহীন সহযোগিতার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি ভারত সম্পর্কে একটি দীর্ঘ প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং তাতে এই যুদ্ধ যে জনযুদ্ধে পরিণত হয়েছে এ কথা বলা হয়। এর পরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি খোলাখুলিই নতুন সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে এবং একই সঙ্গে জাতীয় ঐক্য রক্ষা করা এবং স্বাধীনতার দাবি চালিয়ে যাওয়াকেও তাদের বক্তব্যের অংশ হিসেবে রাখে

১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত পুস্তিকা "ফরওয়ার্ড টু ফ্রীডম" এ

দলের সাধারণ সম্পাদক পি. সি. যোশী নতুন এবং পরিবর্তিত মূল্যায়নের ভিত্তিতে চারটি জাতীয় কর্মসূচি তুলে ধরেন। এগুলি হল

১. ফ্যাসিবাদকে পরাজিত করার জন্যে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং অন্যান্য দলকে নিয়ে একটি জাতীয় ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠন করা।

২. এই রকম জাতীয় ফ্রন্টের ভিত্তিতে বোঝাপড়ায় আসবার জন্যে এবং সমস্ত দলের ঐক্যবদ্ধ সমর্থন সমেত একটি জাতীয় সরকার গঠনের জন্যে চাপ সৃষ্টি করা।

৩. জাতীয় সরকার গঠন ইত্যাদির জন্যে চাপ সৃষ্টি করার পাশাপাশি পুরোপুরিভাবে যুদ্ধের কাজে সহায়তা করা এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বে জনগণকে যুদ্ধের কাজে সহযোগিতার জন্য সংঘবদ্ধ করা।

৪. ভারতীয় জনগণের স্বার্থের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক হবে বলে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতাকে দৃঢ়ভাবে বর্জন করা।[৭]

এর পরে ১৯৪২ সালের ২৩ এপ্রিল কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে সরকারের কাছে দলের নীতি এবং কাজের পরিকল্পনা-সম্বলিত একটি গোপন স্মারকলিপি পাঠানো হয়। এই দলিলে সরকারের যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সহায়তা করার জন্যে দলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের সমর্থনে দেশব্যাপী প্রচার, সৈন্যদলের জন্যে লোক সংগ্রহ করা, যুদ্ধে সহযোগিতা করার জন্য বিশেষ গেরিলা বাহিনী এবং আত্মরক্ষা স্কোয়াড গঠন করা, যাতে কলকারখানায় ধর্মঘটে যুদ্ধের জন্যে উৎপাদন ব্যাহত না হয় তার জন্যে মজুরদের মধ্যে ধর্মঘটবিরোধী এবং উৎপাদনপন্থী প্রচার চালানো ইত্যাদি কাজ করবার প্রস্তাব ব্রিটিশ সরকারকে দেওয়া হয়। এর সঙ্গে সমস্ত ধরনের কমিউনিস্ট বন্দী ও অন্তরীণদের মুক্তি এবং দলের মুখপত্রের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার দাবি জানানো হয়। সঙ্গে সঙ্গে নতুন কাগজপত্র বার করবার অনুমতিও চাওয়া হয়। সমস্ত কমিউনিস্ট বন্দীকে ছেড়ে দেবার দাবির পরিবর্তে তা ক্রমে বাছাই করা কিছু কমিউনিস্ট নেতার মুক্তির দাবিতে এসে দাঁড়ায়। যুদ্ধে সহযোগিতা করার প্রয়োজনে সরকারকে তাঁরা কমিউনিস্ট নেতাদের ছেড়ে দেবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। আগস্ট আন্দোলনের সময়েও কমিউনিস্ট পার্টি একই নীতি এবং কর্মসূচী বজায় রাখে। একই কারণে নেতাজী সুভাষচন্দ্র পরিচালিত আজাদ হিন্দ আন্দোলনের বিরুদ্ধে

কমিউনিস্ট পার্টি সরকার-বিরুদ্ধ কুৎসা এবং নিন্দাই প্রচার করেছিল। ভারতীয় জনগণের মুক্তিকামনা ও সংগ্রামী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে চলায় ১৯৪২-৪৫ কালপর্বে কমিউনিস্ট পার্টি ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা হারায়।[৩]

কমিউনিস্টদের বক্তব্য বর্তমানে সি পি আই এবং সি পি আই (এম) এই দুটি দলের পক্ষ থেকে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[৩-৪] বর্তমান বিষয়ে তাঁদের নিজেদের মূল বক্তব্য সংক্ষেপে উপস্থাপিত করা হল :

১। কমিউনিস্ট পার্টি পুরো ব্যাপারটা দেখেছিল শ্রেণীগত দৃষ্টিকোণ থেকে। কংগ্রেস বুর্জোয়া শ্রেণী এবং জমিদার শ্রেণীর মতাদর্শের প্রতিনিধিত্ব করত। অপরদিকে সি পি আই ছিল শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শের প্রতিনিধি। (M. Basavpunnaiah, পৃ. ১৮)

২। সি.পি আই এর যুদ্ধ-সংক্রান্ত নীতি পরিবর্তন হবার কারণ সোভিয়েত ইউনিয়ন বা ব্রিটিশ কমিউনিস্ট দলের নির্দেশ নয় বরং দলের মধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পলিট ব্যুরো স্তরে আলোচনা, বিতর্ক এবং জেল থেকে প্রেরিত দলের নেতাদের যুদ্ধের পুনর্মূল্যায়নমূলক দলিল প্রভৃতি। (M Basavapunnaiah, পৃপৃ. ২১-২; Chattopadhyay পৃপৃ ১৩-৪; Dilip Basu, পৃপৃ. ৯-১০)

৩। নতুন মূল্যায়ন অনুযায়ী যুদ্ধের দুটি পর্ব : প্রথমটি ২৮ মাস স্থায়ী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পর্ব এবং দ্বিতীয়টি সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হবার ফলে সাড়ে চার বছর স্থায়ী জনযুদ্ধের পর্ব। শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই এই মূল্যায়ন করা হয়। রাশিয়া আক্রান্ত হওয়াটাই একমাত্র কারণ ছিল না। ক্রমঅগ্রসরমান ফ্যাসিবাদের জন্য সমগ্র মানবজাতির পক্ষেই সবচেয়ে মারাত্মক বিপদ হয়ে উঠেছিল, তাকে রোখা সেই সময়ে সবচেয়ে জরুরী ছিল। (M. Basavapunnaiah, পৃপৃ ২৩, ২৬, ২৮; Dilip Basu পৃপৃ ১১-৩; Hiren Mukerjee, পৃপৃ. ১০-১)

৪। ১৯৪০ সালেই চূড়ান্ত সংগ্রাম কংগ্রেসের শুরু করা উচিত ছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় এটা না করে জনযুদ্ধের পর্বে 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'র স্লোগান তোলার থেকে বোঝা যায় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ পরিস্থিতির গুণগত পরিবর্তন (১৯৪১-৪২) কিছুই বোঝেননি। ১৯৩৯-৪২ এই সময়ে তাঁদের

ভূমিকা ছিল চূড়ান্ত সুবিধাবাদী এবং সংস্কারবাদী। (M. Basavapunnaiah, পৃপৃ. ৩০-৩৬, ৩৮, ৬৫)

৫। ঐতিহাসিক দিক থেকে ৪২-এ কমিউনিস্টদের ভূমিকা সঠিক ছিল। কারণ তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয়কে তারা সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয়ের ফলেই ফ্যাসিস্ট অস্তিত্ব নির্মূল হয় এবং যুদ্ধের পরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিও উত্তরোত্তর ক্রমে দুর্বল হয়ে যায়, পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হয়। (তদেব, পৃ. ৩৭)

৬। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে যে স্মারকলিপি সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছিল তাতে গোপন বা লজ্জাজনক কিছুই ছিল না, বরং তাতে কয়েকটি ন্যায্য দাবি ছিল। (M. Basavapunnaiah, পৃ. ৪০, Goutam Chattopadhyay, পৃ. ১৮, Dilip Basu, পৃ. ২৯)

৭। সুভাষচন্দ্র বসু যে রাজনৈতিক লাইন গ্রহণ করেছিলেন (জার্মানী ও জাপানের সহায়তা নেওয়া) তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা অবশ্যই ভুল হবে। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক কৌশলগত (tactical) লাইন যে ফ্যাসিবিরোধী উদ্দেশ্যের পক্ষে কত ক্ষতিকর ছিল তা তুলে ধরে কমিউনিস্টরা ঠিক কাজই করেছিল। গান্ধীও একই কাজ করেছিলেন। (M. Basavapunnaiah, পৃপৃ. ৪৩-৪)

৮। জাতীয় সরকারের জন্যে হিন্দু মুসলমান ঐক্যের চেষ্টা করে কমিউনিস্ট পার্টি ঠিকই করেছিল। তবে মুসলমানদের জন্যে পৃথক বাসভূমির দাবিকে সাম্প্রদায়িক জাতীয় চেতনা (nationality consciousness)-র বিকাশ হিসেবে ব্যাখ্যা করে দল ভুল করেছিল। (M. Basavapunnaiah, পৃপৃ. ৫১-৬, Hiren Mukerjee, পৃ. ১৪)

৯। কমিউনিস্টদের কাছে আকৃষ্ট হয়ে ৪২ আন্দোলনের কিছু নেতা দলে যোগ দেন। বিভিন্ন সরকারী দলিলপত্রে দেখা যায় যে সরকার কমিউনিস্টদের বিশ্বাস করত না কারণ কমিউনিস্টরা সরকারের 'এজেন্ট' ছিলেন না। কমিউনিস্ট কর্মীরা ৪২-এর আন্দোলনে কেউ কেউ শহীদ হন এবং তারা সরকারবিরোধী ভূমিকা নেন। (Goutam Chattopadhyay, পৃপৃ. ১৪-২০, Hiren Mukerjee., পৃ. ১১-৩)

১০। সি.পি.আই মূলত নির্ভুল থাকলেও তার কয়েকটি ক্ষেত্রে 'মারাত্মক কৌশলগত ভুল হয়েছিল। বিশ্ব ফ্যাসিস্টজোটের বিরুদ্ধে লড়াই করতে

দিয়ে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তার আক্রমণের ধার রীতিমত ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল। ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধপ্রচেষ্টায় দলের সমর্থন ব্রিটিশ শাসকদের যুদ্ধনীতি এবং প্রচেষ্টার সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে দেশপ্রেমিক জনগণের বিপুল অংশ সঠিকভাবেই কমিউনিস্টদের ভুল বুঝেছিলেন।

১৯৪৮ সালে দল কর্তৃক প্রকাশিত একটি দলিলে এই ভুলগুলিকে স্বীকার করা হয়। (M. Basavapunnaiah, পৃঃ ৩৮–৯)

অন্যান্য বামপন্থীদের বিশ্লেষণ

আর. এস. পি., আর সি. পি আই প্রভৃতি বামপন্থী দলগুলি সি পি.আই-এর 'জনযুদ্ধ'-এর তত্ত্বের তীব্র সমালোচনা করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর নাৎসী আক্রমণের ফলে যুদ্ধের মৌলিক চরিত্র পরিবর্তিত হয়েছে এ যুক্তি তারা গ্রহণ করে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করে সোভিয়েত ভারত গঠনের মারফতই একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে সাহায্য করা সম্ভবপর—এই ছিল তাদের অভিমত।[৮]

হবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া, এ কথাও তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে বিদ্রোহ অহিংসই হোক অথবা সহিংসই হোক যুদ্ধের পরিবেশে কোনক্রমেই তা বরদাস্ত করা হবে না। [illegible] থেকে একান্ত সংক্ষেপে কথা বলেই ফিরে আসতে হয়। এর পরেই গান্ধীজীর একান্ত সচিব মহাদেব দেশাই এক বিবৃতিতে বলেন, এ কথা ঠিক নয় যে গান্ধীজী 'ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অহিংস বিদ্রোহ শুরু করার কথা বলেছেন। এটা একটা ভুল বোঝাবুঝি ছাড়া কিছুই নয়। এই বিবৃতিতে কংগ্রেস সভাপতি কিছুটা বিস্মিত বোধ করেন। কারণ, আজাদের মতে গান্ধীজী এর আগে অহিংস বিদ্রোহের কথা বলেছিলেন।[৬]

১৪ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট কংগ্রেস সভাপতি বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে আন্দোলনের পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁদের ওয়াকিবহাল করেন। আজাদের গোপন নির্দেশ ছিল এইরকম যে যতক্ষণ গান্ধীজী সমেত অন্য নেতারা জেলের বাইরে থাকবেন ততক্ষণ আন্দোলন কঠোরভাবে অহিংস রাখতে হবে, কিন্তু তাঁদের আটক করা হলে সরকারী হিংসাত্মক মোকাবিলা করবার জন্যে জনগণ যে কোন সম্ভাব্য পন্থা — সহিংস বা অহিংস — গ্রহণ করতে পারে। এর ফলে উদ্ভূত অবস্থার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে বর্তাবে ব্রিটিশ সরকারের উপরে। আজাদের এই বক্তব্যের প্রতি [illegible] পান। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে তাঁর ধারণা হয় যে বাংলা, বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বোম্বাই এবং দিল্লীতে আন্দোলন খুবই ব্যাপক আকার নেবে, কিন্তু অন্যান্য প্রদেশ সম্পর্কে তাঁর নিজের কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। আসামে প্রচুর পরিমাণে সামরিক উপস্থিতি থাকায় বাংলা ও বিহারের মাধ্যমে পরোক্ষে সেখানকার সঙ্গে আন্দোলনের যোগাযোগ স্থাপনের কর্মসূচী নেওয়া হয়।

বড়লাট [illegible] থেকে প্রত্যাখ্যান করবার পরেও গান্ধীজীর এ রকম ধারণা ছিল যে ব্রিটিশ সরকার অতি দ্রুত মারাত্মক কোনো দমনমূলক ব্যবস্থা নেবে না। গান্ধীজী ভেবেছিলেন যে এ আই সি সি. বৈঠকের পরে তিনি যথেষ্ট সময় পাবেন। সেই অবকাশে পরিকল্পনামাফিক আন্দোলনের সূচনা করা যাবে। তবে কংগ্রেসের সভাপতি এ ব্যাপারে গান্ধীজীর মত আশাবাদী ছিলেন না। ২৮ জুলাই আজাদ এক চিঠিতে গান্ধীজীকে এই কথা জানিয়ে সতর্ক করে দেবার চেষ্টা করেন যে বোম্বাই অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গেই দমন ব্যবস্থা নেমে আসবার

এ.আই.সি.সি. অধিবেশনে এঁরা সবাই উপস্থিত ছিলেন এবং যে-কোন মুহূর্তে সরকারী দমনমূলক ব্যবস্থা নেমে আসতে পারে আন্দাজ করে অত্যন্ত দ্রুত আত্মগোপন করেছিলেন। এঁরাই বোম্বাইয়ের কাথিড্রাল স্ট্রীটের একটি বাড়িতে গোপনে নিরুদ্ধ এ.আই.সি.সি. হিসেবে কাজ শুরু করেন। এছাড়া রামমনোহর লোহিয়া, অচ্যুত পট্টবর্ধন এবং সুচেতা কৃপালনী মিলে কেন্দ্রীয় পরিচালন সংস্থা (Central Directorate) নামে একটি সেল গঠন করেন। এখান থেকে বিভিন্ন অঞ্চলের আন্দোলনের খবরাখবর সোজাই এ.আই.সি.সি.-তে পাঠানো হত। এই কার্যালয়কে সি.এস.পি.র গোপন কেন্দ্রীয় কার্যালয় বলেও চিহ্নিত করা চলে। গোপন আন্দোলনের কাজকর্মে দল খুব গুরুত্ব অর্জন করে।[১৭]

১৯৪২ সালের ১০ অগস্টের একটি প্রচারপত্রে সি.এস.পি. এই সংগ্রামকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রাম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সারা দেশে গ্রাম শহরে হরতালের ডাক দেয়।[১৮] দলের সাধারণ সম্পাদক জয়প্রকাশ নারায়ণ ১৯৪২ সালের ৯ নভেম্বর হাজারীবাগ সেন্ট্রাল জেল থেকে অন্য পাঁচজন রাজনৈতিক বন্দীর সঙ্গে পালিয়ে যান। এই সংগ্রামী জনগণের উদ্দেশ্যে লেখা তাঁর দুই অগ্নিক্ষরা খোলা চিঠি দলের কর্মী ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।[১৯] বিভিন্ন অঞ্চলে গেরিলা পদ্ধতিতে আন্দোলন সংগঠন, যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করা, উৎপাদন ব্যাহত করে যুদ্ধের কাজে বাধা সৃষ্টি করা, থানা দখল করা ও অঞ্চল স্বাধীন করা ইত্যাদি বৈপ্লবিক কাজের নির্দেশ দিয়ে জয়প্রকাশ নারায়ণ একের পর এক গোপন পুস্তিকা প্রকাশ করেন এবং এই দলের পক্ষ থেকে গোপন শিক্ষা শিবির তৈরি করা হয়। বিপ্লবী আন্দোলনে অংশ নেবার জন্য দলের বহু কর্মী ও সমর্থক হতাহত হন এবং নেতারা নানা ধরনের অত্যাচারের শিকার হন।

২. ফরওয়ার্ড ব্লক: সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই এই দল এই যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করে এবং যুদ্ধের সুযোগে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য চূড়ান্ত এক আপসবিরোধী সংগ্রামের প্রচার অবিরত চালিয়ে যেতে থাকে।

৮ অগস্ট আই.সি.সি.-তে 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গৃহীত হবার পরেই ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মীরাও আত্মগোপন করেন এবং ১০ অগস্ট এই দলের পক্ষ থেকে "স্বাধীনতার যুদ্ধ" (War of Independence) শীর্ষক একটি প্রচারপত্র

নেতৃত্ব দেন। এই দলের যুক্তপ্রদেশের তরুণ কর্মী রাজনারায়ণ মিশ্রকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

৪। রেভোলিউশনারী কমিউনিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া। আর.সি.পি.আই। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে পরিচালিত আর.সি.পি.আই যদিও কখনও কংগ্রেসের মধ্যে ছিল না, তা সত্ত্বেও এই দল এই আন্দোলনের গণ-চরিত্র অনুধাবন করে এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। আন্দোলন চলাকালীন সময়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য দলের সঙ্গে আর.সি.পি.আই-এর কর্মসূচীগত সমন্বয় সাধিত হয়েছিল। দলের পক্ষ থেকে বলা হয়, বুর্জোয়া কংগ্রেস বিপ্লবের ভয়ে ভীত হয়ে আগস্ট আন্দোলনকে স্যাবোতাজ করেছে।[২১] আর.সি.পি.আই-এর মতে এই পার্টি "জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, আগস্ট গণ বিস্ফোরণের পাশে দাঁড়িয়েছিল। কখনোই বুর্জোয়া কংগ্রেসের পাশে দাঁড়ায়নি।"[২২]

৫। বলশেভিক-লেনিনিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া, বি.এল.পি.আই। ভারতবর্ষের ট্রটস্কিপন্থীরা ১৯৪১ সালে বি.এল.পি.আই গঠন করেন। চতুর্থ আন্তর্জাতিকপন্থী এই দলটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী হিসাবে চিহ্নিত করে। এবং বিশ্বযুদ্ধকে বিপ্লবী প্রয়োজনে ব্যবহারের আহ্বান জানায়।[২৩] কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্বের তীব্র সমালোচনা সত্ত্বেও[২৪] এই দল আগস্ট আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে।

উপরে কেবল কয়েকটি দলের ভূমিকা অথবা দৃষ্টিভঙ্গির কথাই বলা হল। এ ছাড়া আরও কিছু দল এবং বহু ছোট বা আঞ্চলিক রাজনৈতিক গোষ্ঠী ভারতীয় রাজনীতির এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে নানাভাবে সক্রিয় ছিল। উদাহরণস্বরূপ মুসলিম লীগের কথা বলা যেতে পারে। জিন্না প্রমুখ নেতা বহু চিন্তার পরে ভারতীয় মুসলমানদের বলেছিলেন আন্দোলন থেকে বিরত থাকতে। লীগের তখন একমাত্র লক্ষ্য ছিল পাকিস্তান।[২৫] ছোট ছোট দল ও গোষ্ঠীগুলির কথা স্থানাভাবে আলোচনা করা গেল না।

সভা, মিছিল, বিক্ষোভ প্রদর্শন প্রভৃতি সবই হয়েছে। সারা ভারতে প্রায় সমস্ত অঞ্চলে শিল্পশ্রমিকদের ধর্মঘট পালিত হয়েছে। এর মধ্যে আহমেদাবাদ, বোম্বাই, মাদ্রাজ, নাগপুর, দিল্লী, জামসেদপুর, ইন্দোর, বাঙ্গালোর, মহীশূর প্রভৃতি শহরের ধর্মঘট উল্লেখযোগ্য। জামসেদপুরের লৌহ ইস্পাত কারখানার সফল ধর্মঘট যুদ্ধের যোগানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ বাধা সৃষ্টি করেছিল। একথা ভারত সচিব (Secretary of State) আমেরির কাছে ভারতের বড়লাটের লেখা চিঠি থেকে জানা যায়। এছাড়া আহমেদাবাদ এবং গুজরাটের অন্যত্র তিন মাসের বেশী ধর্মঘট চলে। সাতারাতে ২০% শ্রমিক কাজ না করায় এবং বরোদা, ইন্দোর, নাগপুর ও দিল্লীতে সুতাকল ধর্মঘটের ফলে সৈন্যবাহিনীর জন্যে অপরিহার্য খাকি কাপড় উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া সিগারেট শিল্প (কলকাতা, বোম্বাই, বাঙ্গালোর, সাহারানপুর), রেলের গাড়ি উৎপাদন শিল্প (জামালপুর বাজার), চর্মশিল্প (কানপুর), সমর দ্রব্য উৎপাদন শিল্প (দিল্লী) প্রভৃতি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোন কোন শিল্পে যে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয় এ কথা তৎকালীন ভারত সরকারের সরবরাহ দপ্তরের রিপোর্ট থেকে জানা যায়।

গ্রামাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা শহরের থেকে স্বতন্ত্র ছিল। ফলে গ্রামাঞ্চলে বৈপ্লবিক এবং নাশকতামূলক কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া বেশী সুবিধাজনক ছিল। মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠা ও অস্থায়ী সরকার গঠনের কাজ মফস্বল অঞ্চলে বা জেলা শহরে করাই সম্ভবপর হয়েছিল। গ্রামাঞ্চলের নানা ধরনের কর্মসূচীর মধ্যে ছিল : ১। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে প্রতিরোধ বাহিনীর মিছিল নিয়ে যাওয়া, ২। থানা ও পুলিস ফাঁড়ি আক্রমণ করা, ৩। টেলিগ্রাফের তার কেটে দেওয়া, রেলের ফিসপ্লেট ও লাইন অপসারণ করা ও মালগাড়ি লাইনচ্যুত করা, ৪। রেল স্টেশন, রেল গুদাম, ডাকঘর, বিমান ঘাঁটি, সেতু, কালভার্ট প্রভৃতি দখল করা অথবা ধ্বংস করা, ৫। পুলিস এবং সৈন্যবাহিনীর যাতায়াতে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রাস্তায় অবরোধ সৃষ্টি করা প্রভৃতি।[১]

আরও কার্যকর প্রচার চালাবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় পরিচালন সংস্থা বোম্বাইএ গোপন বেতার কেন্দ্র স্থাপন করে। রামমনোহর লোহিয়া এবং দয়াভাই প্যাটেলের পরামর্শ ক্রমে বিঠলদাস (বাবুভাই) খাকার নামের এক ব্যক্তি এই বেতার কেন্দ্র তৈরি করেন। ১৯৪২ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর থেকে

১২ই নভেম্বর এই বেতার কেন্দ্র চালু ছিল। এরপর পুলিস এই কেন্দ্রের সন্ধান পেয়ে যায়।[২]

কেন্দ্রীয় পরিচালন সমিতির নির্দেশের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির গোপন যুদ্ধ পরিষদ থেকে বিপ্লবী কাজকর্ম পরিচালনার জন্যে আলাদা নির্দেশাবলী পাঠানো হয়। উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস যুদ্ধ পরিষদ, উড়িষ্যা কংগ্রেস, অন্ধ্র কংগ্রেস প্রভৃতির পক্ষ থেকে থানা দখল, মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির খুঁটিনাটি নির্দেশ গোপন পুস্তিকা মারফত ছড়ানো হয়েছিল।

জয়প্রকাশ নারায়ণ ১৯৪২ সালের ৯ই নভেম্বর জেল ভেঙে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হন। এর ফলে সংগ্রাম পরিচালনার যথেষ্ট সুবিধা হয়। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি সংগ্রামী জনগণের জন্যে রাজনৈতিক, বৈপ্লবিক ও ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে পর পর কয়েকটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এইরকম একটি পুস্তিকাতে তিনি বিপ্লবের এলাকাগত সংগঠন নিয়ে আলোচনা করেন। বিপ্লবীরা তাঁদের কাজের সুবিধার জন্য সারা ভারতকে অনেকগুলি জেলায় ভাগ করেছিলেন। এই জেলাগুলির প্রতিটিতে গড়ে আড়াইশ জনের গেরিলা বাহিনী গঠন করার কথা বলা হয়। জেলার বিপ্লবী বাহিনীগুলির নাম ঠিক হয় 'আজাদ দস্তা'। জয়প্রকাশ নারায়ণের পরিকল্পনা ছিল যে এক একটি 'দস্তা' বা গেরিলা দলে পঞ্চাশ জন করে বিপ্লবী নিয়ে মোট পাঁচটি 'দস্তা' তৈরি হবে। প্রত্যেক বিপ্লবী নিজের নামের সঙ্গে 'আজাদ' উপাধি ব্যবহার করবেন। জয়প্রকাশ নারায়ণ বিপ্লবীদের প্রধানত তিন ধরনের কাজ করার কথা বলেন। এগুলি হল—যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করা, সরকারী কোষাগার লুঠ ও সরকারের আর্থিক ক্ষতি করা এবং শত্রুপক্ষের ঘাঁটি দখল করা। তিনি সব সময়েই কোনো না কোনো কাজ চালিয়ে যাবার পরামর্শ দেন। তবে প্রাণহানি অথবা আঘাত না করার জন্য আজাদ দস্তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি যে তিন ধরনের কাজের কথা বলেন তার সঙ্গে এই ধরনের নির্দেশ একই সঙ্গে পালন করা বহুলাংশেই অসম্ভব বলে মনে হয়। মনে হয় গণ অভ্যুত্থানের সঙ্গে অহিংসার সমন্বয় ঘটাতে গিয়েই তাঁকে এরকম নির্দেশ দিতে হয়েছিল।

গেরিলারা সব সময়েই অস্ত্রের স্বল্পতার জন্যে অসুবিধা বোধ করতেন। নানা পদ্ধতিতে তাঁদের অস্ত্র সংগ্রহ করতে হত, যেমন থানা ও অস্ত্রাগার লুঠ করা, রেলপথে অস্ত্রের চালান লুঠ করা, কখনও কখনও সৈন্যবাহিনীর

অস্ত্রের গুদাম লুঠ করা, বিভিন্ন লোকের ব্যক্তিগত অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়া, নেপাল থেকে (বিহারের জন্যে) অস্ত্র আনা, এলাকায় এলাকায় বোমা এবং গ্রেনেড তৈরি করা এবং প্রধানত রেল লাইন ও রেল গুদাম লুঠ করে ইস্পাত সংগ্রহ করে তাই দিয়ে ধারালো অস্ত্র তৈরি করা প্রভৃতি। কেন্দ্রীয় পরিচালন সমিতির পক্ষ থেকে খুব সামান্য অস্ত্রই বিভিন্ন এলাকায় পাঠানো সম্ভবপর হয়েছিল।

সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ে আন্দোলনের জন্যে কংগ্রেসের নামে অর্থ দিতে ব্যবসায়ীরা উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু পরে গেরিলা দলগুলি টাকা সংগ্রহ করার জন্যে রাজনৈতিক ডাকাতির আশ্রয় নিতে বাধ্য হত।[৩]

আগস্ট আন্দোলনে ছাত্র সমাজের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। কংগ্রেস অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী সারা দেশে এত ব্যাপকভাবে সমস্ত বয়সের এবং সমস্ত শ্রেণীর ছাত্ররা আন্দোলনে অংশ নেয় যে সেটা ছিল অভূতপূর্ব। "১৯৩০ এবং ১৯৩২ সালের সত্যাগ্রহ আন্দোলনে তাদের অংশ খুব উল্লেখযোগ্য ছিল না। ১৯৪০ সালের ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলন তাদের সাড়া দিতে পারেনি। কিন্তু ১৯৪২ সালের সংগ্রাম তাদের এমনভাবে উজ্জীবিত করেছিল যা অতীতে কখনও হয়নি। এর আগে পর্যন্ত গান্ধীজীর দর্শন এবং তাঁর আপাত জটিল রাজনীতি তাদের বোধগম্য হত না। তারা পশ্চিমী ভাবধারা এবং মতাদর্শের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত ছিল। কিন্তু গান্ধীজীর কর্মকাণ্ড এবং বিপ্লবী ভূমিকা তাদের আকৃষ্ট করেছিল।" (কংগ্রেস অনুসন্ধান কমিটি রিপোর্ট)।[৪]

কোচিনের মত আরও কয়েকটি জায়গায় সংগ্রামরত ছাত্রদের অভিভাবকদের সরকার চাকরী থেকে বরখাস্ত করা বা ব্যবসার উপরে চাপ সৃষ্টি করার হুমকি দেয়। ছাত্ররা সবরকম কাজকর্মেই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। কংগ্রেস রিপোর্টে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ভূমিকার কথা বিশেষভাবে বলা হয়।

একথা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না যে শহরাঞ্চলের শ্রমিকদের মত গ্রামাঞ্চলের চাষীরা ব্যাপকভাবে সংগ্রামে অংশ না নিলে গ্রামাঞ্চলে সংগ্রামের উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। গেরিলা বাহিনীতে অংশগ্রহণ করা থেকে শুরু করে বিপ্লবীদের আশ্রয় দান, খবর সরবরাহ, সংযোজক গোপন কাজকর্ম প্রভৃতি সব ধরনের কাজের মধ্যেই নানা স্তরের

চাষীরা ছিলেন অগ্রণী। গ্রামীন সর্বহারারাও আন্দোলন থেকে বাদ যান নি। এর ফলে তাঁদের উপরে চূড়ান্ত নিপীড়ন চালানো হয়।

রাষ্ট্রীয় পরিষদে (Council of State) সদস্য শ্রী মুখোপাধ্যায়ের বিবৃতি অনুযায়ী বিহার, বাংলা এবং উত্তরপ্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সংগ্রামী জনগণ রেল ব্যবস্থা অচল করে দেয়। অনেকদিন বাংলার সঙ্গে উত্তর ভারতের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকে। অপরদিকে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতেও রেলপথ ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় মাদ্রাজের সঙ্গে দেশের অন্যান্য অংশের সংযোগ ব্যাহত হয়।[৫]

সংগ্রামের প্রবল স্রোত শুধু ব্রিটিশ ভারতেই আবদ্ধ ছিল না, দেশীয় রাজ্যের জনগণের উপরেও এর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। দেশীয় রাজ্যের জনগণের সংগঠনগুলি প্রজামণ্ডল নামে পরিচিত ছিল। হায়দরাবাদ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, বরোদা, ইন্দোর, গোয়ালিয়র এবং উদয়পুর রাজ্যের প্রজামণ্ডলের কার্যকরী সমিতিগুলির পক্ষ থেকে ঐ সমস্ত রাজ্যের নৃপতিদের কাছে জনগণের আন্দোলনে বাধা না দিয়ে সহায়তা করার জন্য আবেদন করা হয়। এর পরেই এই সব রাজ্যের নেতাদের কারারুদ্ধ করা হয়। ব্রিটিশ শাসনের অনুকরণের রীতিতে অনুষ্ঠিত সভা সমাবেশের উপর লাঠি এবং গুলি চালনা শুরু হয়। দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর এবং বরোদায় আন্দোলন সবচেয়ে উগ্র চেহারা নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। উড়িষ্যার কোনো কোনো ছোট রাজ্যে স্বাধীন সরকার পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া ভরতপুর ও কাশ্মীর রাজ্যের শাসকরা জনগণের সংগ্রামে কোন বাধা দেন নি, প্রকাশ্যেই প্রজারা এসব রাজ্যে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করতে পেরেছেন। কোনো কোনো রাজ্যের রাজারা প্রজাদের আন্দোলনে বাধা দিতে না চাইলেও ঐসব রাজ্যের ব্রিটিশ রেসিডেন্টরা রাজাকে পাশ কাটিয়ে নিজেরাই গুলি চালানোর নির্দেশ দেন। মহীশূর এরকম একটি উদাহরণ।[৬]

'ভারত ছাড়ো' সর্বভারতীয় গণসংগ্রাম হওয়ায় উপরে উল্লিখিত শ্রেণীগুলি এবং পূর্ববর্ণিত অঞ্চল, প্রদেশ ও রাজ্যের অধিবাসীরা ছাড়াও অন্যান্য শ্রেণীর এবং সারা ভারতের সমস্ত অঞ্চলের মানুষই এর দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

ব্রিটিশ ভারতের যে সমস্ত অঞ্চলে স্বরাজ বা স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার মধ্যে বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চল বিশেষ করে পাটনা, মুঙ্গের প্রভৃতি

উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বাংলার মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমা, উত্তর প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে বালিয়া জেলা প্রভৃতি এলাকার স্বাধীন সরকার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইসব সরকারের অস্তিত্ব খুব ক্ষণস্থায়ী ছিল। ব্রিটিশ সরকার সৈন্যবাহিনী ও পুলিশের দ্বারা আক্রমণে মুক্তাঞ্চলগুলি পুনরধিকার করে। দু'একটি জায়গায় সরকার তুলনায় দীর্ঘস্থায়ী হয়।[৭]

জনগণের পক্ষ থেকে যে আক্রমণ চালানো হয় তার ফলাফলগত পরিসংখ্যান সারণী ৬১ এবং সারণী ৬২ তে দেওয়া হল। এরমধ্যে সরকারী নির্যাতনের হিসাব দেওয়া হল না। তার জন্য পৃথক তালিকা সারণী ৬৪ দ্রষ্টব্য।

আগস্ট সংগ্রামে বাংলা

বিহারে আগস্ট আন্দোলন যতখানি তীব্রতা ও ব্যাপকতা লাভ করেছিল বাংলাতে তার থেকে কম হলেও বাংলার নানা জেলায়, বিশেষত মেদিনীপুরে সংগ্রাম প্রচণ্ড রূপ নেয়। এই সংগ্রামে মেদিনীপুরের ভূমিকাকে সর্বভারতীয় বিচারে কোন কোন ভাষ্যকার ও অংশগ্রহণকারী ফরাসী বিপ্লবে প্যারিসের ভূমিকার সঙ্গে তুলনা করেছেন।[৮] মেদিনীপুর ছাড়া কলকাতা, হাওড়া, বালুরঘাট, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ঢাকা, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, বর্ধমান, হুগলী প্রভৃতি জেলা ও মহকুমাতেও সংগ্রাম রীতিমত উগ্র চেহারা নেয়। সমগ্র বাংলায় হাজার হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়। চুয়াল্লিশবার গুলি চালানো হয়, যার ফলে শত শত মানুষ নিহত হন। এছাড়া লাঠি চালানো, কাঁদানে গ্যাস ছোড়া, বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, শারীরিক নির্যাতন করে হত্যা করা, ধর্ষণ ও নারী হত্যা করা, আন্দোলনের এলাকায় ব্যাপক লুঠতরাজ ইত্যাদি সবই আন্দোলন দমনের নামে করা হয়েছিল। এই ধরনের অভিজ্ঞতা যে শুধু বাংলার অধিবাসীদেরই হয়েছে তা নয়। বস্তুত ভারতের যেখানেই আগস্ট সংগ্রামের ঢেউ পৌঁছেছে সেখানকার অধিবাসীদের এরকম নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। বাংলার মানুষ যে অন্য সংগ্রামের থেকে পিছিয়ে ছিল না তা নীচে প্রদত্ত সারণী ৬৩ থেকেই বোঝা যাবে।

সারণী—৬.২
আগস্ট সংগ্রামের সর্বভারতীয় অগ্রগতি

(ক)	**রেল**		
১।	ধ্বংসপ্রাপ্ত ও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত রেলস্টেশন—		৩৩২
২।	১৯৪২ সালের ১ অক্টোবর থেকে রেললাইন দারুণ ভাবে ক্ষতি করার ঘটনা*	.	৪১১
৩।	রেলগাড়ির কামরা, ইঞ্জিন, ইত্যাদি ক্ষতি করার ঘটনা	—	২৬৮
৪।	নাশকতামূলক কাজের ফলে ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়া এবং অন্যান্য ধরনের দুর্ঘটনা	—	৬৬
৫।	টাকার অঙ্কে রেল সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ	—	৫২,০০,০০০
(খ)	**ডাক ও তার বিভাগ**		
১।	ধ্বংসপ্রাপ্ত অথবা গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ডাক-তার ঘর, ছোট ডাকঘর প্রভৃতি	—	৯৪৫
২।	টেলিগ্রাফ, টেলিফোন প্রভৃতি লাইন ধ্বংস করার ঘটনা	—	১২,২৮৬

*১৯৪২ সালের ১ অক্টোবরের আগে রেলপথের ক্ষতি এত ব্যাপকভাবে হয় যে সেরকম ঘটনার সঠিক সংখ্যা পাওয়া অসম্ভব। এই সময়ের মধ্যে রেলপথের ক্ষতি পরের সময়কার তুলনায় অনেক বেশী, আনুমানিক ৯ লক্ষ টাকার সমান।

সূত্র :—সারণী ৫·১ এর মতো।

সারণী – ৬.৩
বাংলায় আগস্ট সংগ্রাম

	বিষয়	সংখ্যা
১।	শ্রমিক ধর্মঘট	৪০
২।	গণ আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত থানা	১১
৩।	গণ আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত ঋণ নিষ্পত্তি বোর্ড	২১

	বিষয়	সংখ্যা
৪।	ধ্বংসপ্রাপ্ত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন বোর্ড	৫৭
৫।	" " " ডাকঘর	১১৮-র বেশী
৬।	" " " আদালত	৬
৭।	" " " আবগারী দোকান	২৬
৮।	" " " ট্রামগাড়ি	১৮
৯।	" " " টেলিফোনের তার	৬১টি এলাকা
১০।	" " " রেলপথ	১৩টি জায়গা
১১।	" " " রেল ও স্টীমার স্টেশন	১৪
১২।	" " " জমিদারী কাছারি	১৮
১৩।	" " " অন্যান্য সরকারী অফিস	৭৪
১৪।	দখলীকৃত সরকারী অস্ত্র	১৩টি বন্দুক, ১টি তলোয়ার।
১৫।	" " বাড়ি ও জমি (যে সব অফিসে পতাকা তোলা হয়েছে সেগুলি সমেত)	৬১

মেদিনীপুর জেলার কাঁথি ও তমলুক মহকুমায় সুষ্ঠু ভাবে পরিকল্পনা অনুযায়ী আন্দোলন চালানো হয় এবং সংগ্রামকারীরা শীঘ্রই মহিষাদল, সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম, তমলুক, পাঁশকুড়া, ময়না প্রভৃতি থানা দখল করে নেয় এবং অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠান দখল করার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন সরকার, প্রশাসন, জাতীয় সেনাবাহিনী (এর নাম ছিল 'বিদ্যুৎ বাহিনী'), জাতীয় পুলিশ, জাতীয় আদালত, রোগ সেবা বিভাগ ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে। স্বাধীন সরকার নিজস্ব মুখপত্র 'বিপ্লবী' প্রকাশ করতে থাকে। এই জাতীয় সরকারের প্রথম সর্বাধিনায়ক ছিলেন সতীশচন্দ্র সামন্ত। তিনি ছাড়াও অজয় মুখোপাধ্যায়, সুশীল ধাড়া, এস সি মহাপাত্র প্রমুখ অন্যান্য নেতা ছিলেন। মেদিনীপুরকে এই সংগ্রামের জন্যে প্রভূত মূল্য দিতে হয়। সরকারী তরফে শুধু পুলিশি নির্যাতন যথেষ্ট ছিল না। ১৯৪২ সালের ১৬ অক্টোবর মেদিনীপুর প্রচণ্ড সাইক্লোনের শিকার হলে যে অবর্ণনীয় দুর্দশার সৃষ্টি হয় তার সুযোগে এই জেলার মানুষদের 'শিক্ষা' দেবার জন্যে ব্রিটিশ সরকার বন্যা ও ঝড়বিধ্বস্ত মেদিনীপুরে কোন প্রকার সাহায্য ও ত্রাণ জেলার বাইরে থেকে পাঠানো নিষিদ্ধ করে দেয়।[১]

বাংলার বিভিন্ন জেলায় আন্দোলনে, বিশেষত উত্তরবঙ্গে সাঁওতাল ও

অন্যান্য আদিবাসীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু প্রভৃতি বাদে ভারতের অধিকাংশ প্রদেশের মতই বাংলাদেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের বৃহত্তর অংশ আগস্ট সংগ্রামে অংশ নেন নি। মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক প্রচারের ফলে সরকার বাংলায় প্রধানত উত্তর বঙ্গের বালুরঘাট মহকুমার মুসলমানদের সংগ্রাম দমন করার কাজে ব্যবহার করতে পেরেছিল।[10]

সরকারী প্রতিক্রিয়া

ব্রিটিশ সরকার প্রথম থেকেই আগস্ট আন্দোলনকে সমস্ত শক্তি দিয়ে দমন করবে ঠিক করে এবং সেই অনুযায়ী '৪২ সালের ৯ আগস্ট ভোর থেকেই কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার শুরু করে। এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত বড় নেতা গ্রেপ্তার হন। কেবল আত্মগোপনকারী নেতারাই কিছুদিনের জন্যে গ্রেপ্তার এড়াতে পেরেছিলেন। সরকার অনতিবিলম্বে কংগ্রেস এবং তার সহযোগী সমস্ত সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে একটি ইস্তাহারে কংগ্রেসকে এককভাবে সবকিছুর জন্যে দায়ী করা হয়। এতে সরকার 'বিশৃঙ্খলা' ও 'উৎপাত' দমনের জন্যে যে সমস্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে তার হুমকি দেওয়া হয়। এই সমস্ত ব্যবস্থা নিতে সরকারকে বাধ্য করার দায়িত্বও কংগ্রেসের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়।

সামরিক আইন জারি না করেও সরকার কার্যত সারা ভারতে ত্রাসের রাজত্ব গড়ে তোলে। গণঅভ্যুত্থান দমনের জন্য অনেক নতুন অর্ডিন্যান্স এবং বিশেষ আইন তৈরি হয়। উদাহরণস্বরূপ শাস্তিদান অর্ডিন্যান্স (Penalties Enhancement Ordinance), যৌথ জরিমানা অর্ডিন্যান্স, বিশেষ আদালত অর্ডিন্যান্স, বেত্রাঘাত অর্ডিন্যান্স (Whipping Ordinance) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়। এই সব আইনের নামে লুঠ-পাট, চাবুকমারা, খুন করা, প্রভৃতিকে আইনসিদ্ধ করা হয়। বিশেষ আদালতে বহু মানুষকে ফাঁসির হুকুম দেওয়া হয়, সেই সঙ্গে পাইকারী হারে অসংখ্য মানুষকে দীর্ঘ মেয়াদী কারাদণ্ড দেওয়া হয়।[11] সেইসময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এবং বিশেষ করে বিহার ও উত্তরপ্রদেশে সরকারী প্রশাসন বিক্ষোভ আন্দোলন দমন করার জন্যে বিভিন্ন ধরনের বেআইনী, বর্বর ব্যবস্থা নিয়েছিল। পরবর্তী কালে আইন পাস করে এই ধরনের কার্যকলাপকে বৈধ রূপ দেওয়া হয়।[12]

সরকারপক্ষ থেকে আন্দোলন দমন করার নামে জনগণকে 'শিক্ষা' দেবার

আন্তর্জাতিক কারণগুলির কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু এগুলি ছাড়া ভারতীয় রাজনীতির কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা কি তাঁর উপরে প্রভাব বিস্তার করেছিল? অগস্ট আন্দোলনের সময়কার কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মতে প্রথমত, গান্ধীজীর এই ধারণা জন্মেছিল যে মিত্রপক্ষ যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ভারত ত্যাগ এবং অক্ষশক্তির সহায়তা লাভ গান্ধীজীর উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর আগেকার সমালোচনামূলক মনোভাব ক্রমেই গুণগ্রাহিতায় পরিবর্তিত হচ্ছিল। তৃতীয়ত, গান্ধীজী ধারণা করতে পারেন নি যে আন্দোলন শুরু হতে না হতেই সরকার সমস্ত শক্তি নিয়ে আন্দোলন দমন করতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। বরং তাঁর ধারণা ছিল যে তিনি ধীরেসুস্থে নিজের নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে তোলার সুযোগ পাবেন। আন্দোলন শুরু করার অব্যবহিত আগেও তিনি নিজে প্রতিরোধের পন্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ধারণা গড়ে তুলতে পারেননি। কারণ গান্ধীজী ভেবেছিলেন যে, বোম্বাইয়ে এ. আই. সি. সি.-র সভায় আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণের পরে (৮ আগস্ট '৪২) তিনি ধীরে ধীরে আন্দোলনে গতি সঞ্চার করবেন। ৯ অগস্ট ভোর-বেলাতেই পুলিশ গান্ধীজী সমেত প্রথম সারির প্রায় সমস্ত কংগ্রেস নেতাকে গ্রেপ্তার করায় পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি যে মূল্যায়ন করেছিলেন তা ভুল বলে প্রমাণিত হল, এবং মৌলানা আজাদের মতে সরকারের আকস্মিকতায় গান্ধীজী বিস্মিত হয়ে পড়েন।[১] তিনি আন্দোলন শুরু করবার আগে বড় লাটকে যে চূড়ান্ত পত্র দেবেন ভেবেছিলেন তা আর হয়ে ওঠেনি।

টোটেনহ্যামও গান্ধীজীর আচরণ পরিবর্তনের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একই ধরনের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, গান্ধীজীর ধারণা হয়েছিল যে ব্রিটিশ সরকার আর ভারতে জাপানী আক্রমণ ঠেকাতে পারবে না। বরং ভারতকে যুদ্ধক্ষেত্র বানিয়ে তারা জাপানের হাতে পরাজিত দেশ হিসেবে ছেড়ে যাবে। এরকম হলে স্বরাজের স্বপ্ন সফল হবে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্ত্যেষ্টির সঙ্গে ডুবে গেলে আত্মরক্ষার স্বাধীন অবকাশটুকুও থাকবে না। এমন অবস্থার চেয়ে আভ্যন্তর বিশৃঙ্খলাও ভাল। এইসব কারণে গান্ধীজীর হয়ত মনে হয় যে ভারতে ব্রিটিশ না থাকলে কংগ্রেস একটি নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণের ব্যাপারে জাপানের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে পারে। এই ধরনের কিছু ভাবনাচিন্তা হয়ত তাঁর ক্রীপস্ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের পিছনে ছিল। কিন্তু

উইংকেনহ্যাডন মনে করেন যে প্রবল যুদ্ধবিরোধী মনোভাবই গান্ধীজীর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের অন্যতম কারণ। এইখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের গভর্নর স্যার টোয়াইনাম এর মতে গান্ধীজী যে ভারতে ব্রিটিশ সৈন্যের অবস্থান মেনে নিয়েছিলেন তার কারণ এর বিনিময়ে তিনি নেহরু ও আজাদকে 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব সম্পর্কে রাজী করাতে পেরেছিলেন। ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড লিনলিথগোর মতে "মহাত্মা গান্ধী যে হিংস্র ভাষা (violent language ব্যবহার করতেন তা ভালো রকমের 'সক্রিয় ভাল্ভ' ছাড়া আর কিছু ছিলনা এবং সব সময়ে সেইসব কথা অর্থবাহী হত না।" তিনি গান্ধীজীর 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব এবং সংশ্লিষ্ট বক্তৃতা সম্বন্ধে এ কথা বলেন। গান্ধীজীর সচিব পিয়ারীলালের বক্তব্য অনুযায়ী 'ভারত ছাড়ো' এই শব্দটিও নাকি গান্ধীজীর নিজের উদ্ভাবিত নয়। আগস্ট আন্দোলন শুরু হবার অব্যবহিত আগে জনৈক মার্কিন সাংবাদিকের সঙ্গে গান্ধীজীর সাক্ষাৎকারের সময়ে ঐ সাংবাদিক এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। পরে এটিই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। গান্ধীজী নিজে যে শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন সেটি নাকি ছিল 'বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে ব্রিটিশ প্রত্যাহার' (**orderly British withdrawal**)।[২০]

উল্লিখিত কারণগুলি ছাড়া ক্রমবর্ধমান জনমতের চাপ ও সাধারণ কংগ্রেস কর্মীদের সংগ্রামী মনোভাবও সম্ভবতঃ গান্ধীজীর আচরণ পরিবর্তনের জন্যে দায়ী ছিল।

আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ও পরিণাম

৯ আগস্ট, ১৯৪২ মৌলানা আজাদ, জওহরলাল নেহেরু, আসফ আলী, সৈয়দ মাহমুদ, আচার্য কৃপালনী, শংকর রাও দেও প্রমুখ নেতাদের আহমেদনগর কারাদুর্গে বন্দী করে পাঠানো হয় এবং তাঁদের সৈন্য বিভাগের হেফাজতে রাখা হয়। এছাড়া গান্ধীজীকে আগা খাঁ প্রাসাদে আটক করা হয়। এইখানে ১৯৪৩ সালের শুরুতে গান্ধীজী একুশ দিনের জন্যে আত্মশুদ্ধিমূলক অনশন শুরু করেন। তাঁর শারীরিক অবস্থা আশংকাজনক হয়ে ওঠায় বড়লাট তাঁকে মুক্তি দেবার সিদ্ধান্ত নেন। অন্যান্য আটক নেতাদের কাছে এই সিদ্ধান্ত আকস্মিক ছিল। মৌলানা আজাদের ধারণা হয় যে এই সময়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতির এত বেশী পরিবর্তন হয় যে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে গান্ধীজীকে মুক্তিদানে ভয়ের কিছু সম্ভাবনা ছিল না। অন্যান্য নেতারা যখন জেলে, তখন মুক্তি

পেয়ে গান্ধীজী খুব সামান্যই কাজ করতে পারতেন। অপরদিকে জেলখানার বাইরে তাঁর উপস্থিতির ফলে যারা অহিংস পন্থায় আন্দোলন চালাবার চেষ্টা করছিল তাদের উপরেও খানিকটা নিয়ন্ত্রণ আরোপ হতে পারে।[২১] মুক্তি লাভের পরে গান্ধীজী দুটি প্রচেষ্টা শুরু করেন। প্রথমত, তিনি মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবি নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। দ্বিতীয়ত, তিনি সরকারের সঙ্গে আপস আলোচনার চেষ্টা শুরু করেন। গান্ধীজী আন্দোলনের হিংসাত্মক ঘটনাবলীর জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেন। কিন্তু এটা যে সরকারী অত্যাচার এবং দমনের প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কিছু নয়, সে কথাও বলেন।[২২]

গান্ধীজী জিন্নার সঙ্গে নিজের উদ্যোগে যে আলোচনা শুরু করেন সে ব্যাপারে হিন্দু ও শিখ জনগণের ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয় কারণ এই আলোচনা ছিল পাকিস্তান প্রস্তাবকে কার্যত স্বীকার করে।[২৩] তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদের মতে জিন্নার সঙ্গে গান্ধীজীর এই আলোচনা ছিল 'বিরাট একটা রাজনৈতিক ভুল'। তার ফলে গান্ধীজী জিন্নার রাজনৈতিক গুরুত্ব না বুঝে এইভাবে তাঁকে আরও বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলেন। জিন্না বহুকাল পূর্বে গান্ধীর দ্বিতীয় পর্যায়ে কংগ্রেস ত্যাগ করার পরে তাঁর রাজনৈতিক গুরুত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। গান্ধীজী অবাঞ্ছিত ভাবে গুরুত্ব দেওয়াতেই ভারতীয় মুসলমানদের বৃহৎ অংশ তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছিল বলে মৌলানা আজাদের বিশ্বাস ছিল। ১৯৪৪ সালের জুন মাসে গান্ধী জিন্না আলোচনা বিফল হয়। যদিও আজাদের মতে জিন্না তাঁর নিজের গুরুত্ব বৃদ্ধির স্বার্থে এই আলোচনাকে পূর্ণ ব্যবহার করেন।[২৪]

গান্ধীজী সরকারের সঙ্গে আলোচনা শুরু করার প্রস্তাব হিসাবে একথা ঘোষণা করেন যে যদি ভারতকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করা হয় তবে ভারত স্বেচ্ছায় ব্রিটিশ পক্ষ নিয়ে এই যুদ্ধে সহযোগিতা করবে (নিউজ ক্রনিকল্-এ প্রদত্ত বিবৃতি)। গান্ধীজীর এই বিবৃতির সঙ্গে তাঁর আগেকার যুদ্ধবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না, বরং এই পরিবর্তনকে আকস্মিক বলে বোধ হয়। এই বিবৃতির ফলে দেশের মধ্যে ও বাইরে অনেকে তাঁকে ভুল বোঝেন।[২৫]

কিন্তু গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হলেও ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর কোন পরিবর্তন হয় নি এবং তাঁরা বিভেদনীতির মাধ্যমে শাসন করার নীতি অনুযায়ী ১৯৪৫ সালের ২৫ জুন সিমলায় একদল উচ্চ নেতার উপস্থিতিতে

সর্বদলীয় সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল বড়লাটের কার্যকরী পরিষদ গঠন করা যাতে তার মধ্যে ভারতের প্রধান সম্প্রদায়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় এবং উচ্চবর্ণের হিন্দু ও মুসলমানদের সমান প্রতিনিধিত্ব থাকতে পারে। এই সম্মেলনের আগে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নেতাদের মুক্তি দেওয়া হয়। কংগ্রেস এই সময় সংগ্রামের পথ পুরোপুরি বর্জন করে এবং ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পুনা ও বোম্বাই এ অনুষ্ঠিত যথাক্রমে ওয়ার্কিং কমিটি ও এ আই সি সি-র অধিবেশনে সিমলা সম্মেলনের ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। অবশ্য গান্ধীজী নিজে রাজনৈতিক কার্যকলাপের পরিবর্তে গঠনমূলক কাজে পুরোপুরি আত্মনিয়োগের পক্ষে ছিলেন। এ আই সি সি তে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে আটক বন্দীদের মুক্তির জন্যে সরকারের কাছে আবেদন করা হয়। এরপর বন্দীরা পর্যায়ক্রমে মুক্তি পান।

অপরদিকে যে সব রাজনৈতিক কর্মী বা নেতা গোপন আন্দোলনের মধ্যে ছিলেন অন্তর্বর্তী সময়ে সরকারী দমনের পাশাপাশি তাঁদের অন্য ধরনের মানসিক চাপ ও নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছিল। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে কট্টর অহিংসবাদীরা পরিচালকমণ্ডলীর (Directorate) দিল্লী বৈঠকে বহু গোপন ও ধ্বংসাত্মক কাজের সমালোচনা করেন। সি এস পি নেতারা সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্যে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী গান্ধীবাদী নেতাদের সঙ্গে আপস করতে বাধ্য হন। তাঁরা এই কারণে একই সঙ্গে ধ্বংসাত্মক এবং অন্য ধরনের কাজকর্ম পাশাপাশি চালাবার প্রস্তাব দেন।

গান্ধীবাদী নেত্রী সুচেতা কৃপালনী সরকারী অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তাঁদের মাধ্যমে গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার করেন। গান্ধীজী হিংসাশ্রয়ী কাজের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত আপত্তির কথা সুচেতা কৃপালনীকে জানান। এরপরে যখন সাদিক আলী গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করেন গান্ধীজী তখন তাঁকে বলেন যে প্রত্যেককে তার নিজের বিবেক অনুযায়ী চলবার স্বাধীনতা তিনি দিয়েছেন, কাজেই তিনি কোন অসন্তোষ প্রকাশ করছেন না, কিন্তু তিনি নিজে ধ্বংসাত্মক ও হিংসাশ্রয়ী কাজের বিরোধী।

এরপরে দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং গান্ধীবাদী গোষ্ঠী অবস্থা পর্যালোচনার জন্যে বোম্বাইয়ে পরিচালকমণ্ডলীর সভা আহ্বান করে। এঁদের নেতৃত্বে ছিলেন সাদিক আলী ও সুচেতা কৃপালনী। অন্যদিকে সহিংস

সংগ্রামপন্থীদের নেতা ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ, রামমনোহর লোহিয়া, অচ্যুত পট্টবর্ধন, অরুণা আসফ আলী প্রমুখ। আগস্ট বিদ্রোহের অন্তে জয়প্রকাশ নারায়ণ দুই থেকে তিন মাসের জন্যে সহিংস আন্দোলন স্থগিত রাখার প্রস্তাব দেন, কিন্তু এর ফলে দুই গোষ্ঠির বিরোধ কমেনি। বরং ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গান্ধীবাদী গোষ্ঠী আলাদা হবার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সুচেতা কৃপালনী কেন্দ্রীয় পরিচালকমণ্ডলী থেকে পদত্যাগ করেন। এরপরে গান্ধীবাদী গোষ্ঠী 'সারা ভারত সত্যাগ্রহ পরিষদ' গড়ে তোলেন। এর নেতৃত্বে ছিলেন সুচেতা কৃপালনী। এই পরিষদের পক্ষ থেকে ১৯৪৪ সালের ১৩ই মে একটি বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হয় যে গান্ধীজীর নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত সমস্ত আক্রমণাত্মক কর্মসূচী বন্ধ থাকবে। এই বছরে ৯ অগাস্ট পালনের কর্মসূচীর ক্ষেত্রে সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী দুটি গোষ্ঠির মধ্যে মত ও পথের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গান্ধীবাদী গোষ্ঠি পতাকা উত্তোলন, প্রভাত ফেরি, চরকা কাটা এবং 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব পাঠের মাধ্যমে ৯ অগাস্ট পালন সীমাবদ্ধ রাখেন। এর বিপরীতে কেন্দ্রীয় পরিচালকমণ্ডলীর কর্মসূচীর মধ্যে ছিল হরতাল বা বন্ধ পালন, সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা, সরকারকে খাদ্যশস্য বিক্রি না করা, সৈন্য বিভাগে অসন্তোষ গড়ে তোলা, প্রভৃতি।

কেন্দ্রীয় পরিচালকমণ্ডলী গান্ধীজীর সহানুভূতি লাভ করেনি। বরং গান্ধীজী দেশব্যাপী ধ্বংসাত্মক আন্দোলনের জন্যে পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যদের দায়ী করেছিলেন। আন্দোলনের অনেক নেতা গোপনে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করলে তিনি তাঁদের তীব্র ভর্ৎসনা করেন। বিপরীত শিবির থেকে আত্ম-গোপনকারী নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কুৎসা রটনা এবং চরিত্র হনন করার জন্যেও আক্রমণ চালানো হয়। এর ফলে তাঁদের অনেকেরই মন ভেঙে যায়। অবশ্য ১৯৪৫ সালের ১৫ই জুন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা ছাড়া পাবার পরে তাঁদের মধ্যে জওহরলাল নেহরু ও বল্লভভাই প্যাটেল আত্মগোপনকারী নেতাদের খোলাখুলি প্রশংসা করেছিলেন।

এই বছর ডিসেম্বরে কলকাতায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় এই মর্মে প্রস্তাব নেওয়া হয় যে নেতৃত্বহীন জনগণ কিছু কিছু বীরত্বপূর্ণ কাজ করলেও '৪২-এর অগাস্ট আন্দোলনকে কোনভাবেই সমর্থন করা যায় না। এর কারণ এই আন্দোলন ছিল ধ্বংসাত্মক, অহিংস নয়। প্রস্তাবে ১৯২০ সাল থেকে অনুসৃত অহিংস আন্দোলন পদ্ধতিকেই কংগ্রেসের দিশা হিসাবে আবার

ঘোষণা করা হয়। এই প্রস্তাবে আগস্ট সংগ্রাম সম্পর্কে কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল যেন ক্ষমাপ্রার্থীর।[২৬]

এইভাবে আগস্ট সংগ্রাম জনগণের বীরত্ব এবং আত্মত্যাগ সত্ত্বেও প্রত্যক্ষ ফললাভে ব্যর্থ হয়।

সপ্তম অধ্যায়
আজাদ হিন্দ্ সংগ্রাম

সুভাষচন্দ্রের ভারত ত্যাগ

১৯৩৯ সালে সি এস পি এবং কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ হবার পরে ফরওয়ার্ড ব্লক যথেষ্ট একা হয়ে যায় এবং আলাদা ভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রচার চালাতে থাকে। সংগ্রামী পথে সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ফরওয়ার্ড ব্লকের উদ্যোগে এবং সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে কলকাতায় হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তথাকথিত 'অন্ধকূপ হত্যা' ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে ব্রিটিশ সরকার এই মনুমেন্ট বানিয়েছিল। হিন্দু মুসলমান সংহতির পক্ষে এই আন্দোলন বিশেষ কার্যকরী হবে বলে সুভাষচন্দ্রের ধারণা ছিল। ১৯৪০ সালের ২ জুলাই আন্দোলন শুরু হবার সময়ে তিনি এ সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণায় উপনীত হন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন তাঁর মুক্তির আশা খুবই কম। ফলে তিনি মুক্তির দাবীতে ঐ বছরের ২৯ নভেম্বর থেকে আমরণ অনশন শুরু করেন। তাঁর শারীরিক অবস্থার গুরুতর অবনতি হওয়ায় ৫ ডিসেম্বর তাঁকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে গৃহে অন্তরীণ রাখা হয়। এই সময়ে তিনি আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার কারণে নিজের ঘরে প্রায় সমস্ত মানুষের সংস্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করতেন। নিজের পরিবারেরও কেবল অল্প কয়েকজনই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারতেন। ব্রিটিশ পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ বাইরে থেকে তাঁর উপরে নজর রাখার কাজ করত।

আসলে এই সময়ে তিনি সংগোপনে ছদ্মবেশে ভারত ত্যাগের দুঃসাহসিক পরিকল্পনা করছিলেন। অবশেষে ১৯৪১ সালের ১৭ জানুয়ারির মধ্যরাতে তিনি মৌলবী জিয়াউদ্দীন ছদ্মনামে পাঠানের বেশে কলকাতা ত্যাগ করেন। বিহারের গোমো পর্যন্ত মোটর গাড়িতে গিয়ে তিনি সেখান থেকে পেশোয়ার যান। সেখান থেকে রহমৎ খান ছদ্মনামে ভগৎরাম তলোয়ার-এর সহযোগিতায় অত্যন্ত বিপদসংকুল পথে খাইবার গিরিপথ অতিক্রম করে উপজাতীয় গ্রামের মধ্যে দিয়ে কাবুল পৌঁছন। সুভাষচন্দ্রের লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করা। কিন্তু কাবুলে যে কোন সময়ে ধরা পড়ে যাবার সম্পূর্ণ ঝুঁকি নিয়ে চারদিন কাটাবার পরেও তাদের সোভিয়েত দূতাবাসের

সঙ্গে যোগাযোগ করবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এমনকি রাস্তায় সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতের গাড়ি থামিয়ে তাঁকে নিজের কথা বোঝাবার চেষ্টা করেও তাঁরা ব্যর্থ হন। পঞ্চম দিনে ইটালিয়ান দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। এই সময়ে সুভাষচন্দ্র উত্তমচাঁদ মালহোত্রার বাড়িতে আশ্রয় নেন। তিনি আরও কয়েকবার সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অবশেষে দেড়মাস আত্মগোপন করে থাকার পরে ১৮ মার্চ সুভাষচন্দ্র সেনর অরলান্ডো মাজ্জোটা ছদ্মনামে ইটালিয়ান পাসপোর্ট নিয়ে রেলপথে মস্কো পৌঁছন এবং সেখান থেকে ২৮ মার্চ বিমানপথে বার্লিন যাত্রা করেন[১]।

জার্মানীতে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ

সুভাষচন্দ্র রোমে মুসোলিনির কাছ থেকে সমাদর পান এবং মুসোলিনি তাঁকে সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন। কিন্তু জার্মানীতে হিটলারের কাছ থেকে সমর্থন পাওয়া যে খুব সহজ হবে না এ আশঙ্কা সুভাষচন্দ্রের ছিল। তিনি বিদেশের মাটিতে ভারতীয়দের নিয়ে জাতীয় সৈন্যদল এবং অস্থায়ী জাতীয় সরকার গড়ে তুলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা করেছিলেন। এই পরিকল্পনার পিছনে প্রধানতঃ তিনটি নীতি ছিল। এগুলি হল: ১. শত্রুর শত্রু আমার মিত্র, ২। স্বাধীনতা আপসরফার মাধ্যমে ভিক্ষা পাওয়া যায় না, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের দ্বারা অর্জন করতে হয়, ৩. ভিক্ষালব্ধ স্বাধীনতাও বেশীদিন রক্ষা করা যায় না, যদি দেশ স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করতে এবং যে কোন মূল্যে সেই স্বাধীনতা রক্ষা করতে প্রস্তুত না থাকে।[২]

হিটলারের ভারতীয় জাতির সম্পর্কে ঘৃণা এবং অবজ্ঞা সুস্পষ্ট ছিল আত্মজীবনীতেও সে কথা ফ্যাসিবাদী হিটলার স্পষ্ট ভাষায় লেখেন। তিনি ভারতে ইংরেজ প্রভুত্বের সমর্থক ছিলেন। শুধু বিশ্বযুদ্ধের সুযোগেই সুভাষচন্দ্র জার্মানীতে প্রবেশের অধিকার লাভ করতে সমর্থ হন। সুভাষচন্দ্র জার্মানী পৌঁছে প্রথমেই হিটলারের আত্মজীবনীতে (Mein Kampf) লেখা ঘৃণা সূচক মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন ঐ কথা প্রত্যাহারের দাবি জানান এবং হিটলার বইটি থেকে ঐ অংশগুলি বাদ দিয়ে দেন[৩]। এর আগে ১৯৩৪ সালে যখন সুভাষচন্দ্র জার্মানীতে আসেন তখন তাঁর সফর ছিল বেসরকারী, ফলে নাৎসি পার্টি ইহুদি, কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্য রাজনৈতিক

বিরোধী গোষ্ঠীর উপরে যে নির্মম অত্যাচার চালায় তা তিনি দেখেছিলেন।[৪] তৎসত্ত্বেও ১৯৪১ সালে জার্মানীর সহায্য নেবার যে চেষ্টা সুভাষচন্দ্র করেছিলেন তার একটা সম্ভাব্য কারণ হল, যেহেতু তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতা লাভের ইচ্ছা তাঁর সবচেয়ে তীব্র থাকলেও এ ব্যাপারে তিনি সফল হতে পারেন নি। সেই অবস্থায় কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার নীতিই হয়ত তাঁর কাছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ছিল।

সুভাষচন্দ্র নাৎসি সরকারের সাহায্যে নিজের পরিকল্পনা রূপ দিতে গিয়ে বিশেষ বেগ পান। অপরদিকে তাঁকে নিয়ে নাৎসি সরকারও যথেষ্ট ঝামেলায় পড়ে। জার্মানীতে সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা রূপায়ণের সম্ভাবনা না থাকলে যেমন প্রাণ বিপন্ন করে তিনি ব্রিটিশ পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে ভারত ছেড়েছেন তেমনি করেই জার্মান গোয়েন্দাদের ফাঁকি দিয়ে আবার জার্মানী ছাড়বেন—এই কথাও ঠাণ্ডা ভাষায় সুভাষচন্দ্রের জার্মান সরকারকে বলে দিতে হয়েছিল।[৫] কংগ্রেস বা ঐ রকম কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পরিচয়পত্র সুভাষচন্দ্রের না থাকায় জার্মান সরকার তাঁর নাম ও রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে সামরিক সহায়তা দান করতে চাইছিলেন না। তাঁরা কেবল সুভাষচন্দ্রকে রাজনৈতিক আশ্রয় দানের কথাই ভাবছিলেন কিন্তু সুভাষচন্দ্রের তা মোটেই মনঃপূত ছিল না। তবে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে সুভাষচন্দ্রকে পুরোপুরি ত্যাগ করতেও জার্মানী তৈরী ছিল না, ফলে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবার আগে পর্যন্ত বেতার প্রচার শুরু করার প্রস্তাবে দু'পক্ষই রাজি হয়। সুভাষচন্দ্রের লক্ষ্য ছিল জার্মানী অথবা অন্য কোন দেশের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করা। তাঁর কর্মসূচীর মধ্যে ছিল প্রথম ইউরোপের দেশগুলিতে বসবাসকারী ভারতীয়দের নিয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান 'স্বাধীন ভারত কেন্দ্র' (Free India Centre) গঠন করা। এই কেন্দ্র বেতার প্রচার, ভারতীয় সৈন্যদল, হিন্দী প্রভৃতি বিভাগগুলিকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করবে। তাঁর দ্বিতীয় পরিকল্পনা ছিল ভারতীয় যুদ্ধবন্দী সৈনিকদের নিয়ে সৈন্যদল হিন্দ (Indian Legion) গঠন করা। এছাড়া কর্মসূচীর মধ্যে ছিল স্বাধীন ভারতে কি কি ধরনের আর্থনীতিক ও সামাজিক সমস্যাবলী হতে পারে তা অনুধাবন করার জন্য পরিকল্পনা কমিটি গঠন করা।

এই সমস্ত কাজের জন্য জার্মান সরকার ১৯৪১ সালে প্রতি মাসে কেন্দ্রকে

১২০০ পাউণ্ড হিসেবে ধার দিতে শুরু করে যা ১৯৪৪ সালে বেড়ে প্রতি মাসে ৩২০০ পাউণ্ডে দাঁড়ায়। সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিগত ভাতা ঠিক হয় মাসিক ৮০০ পাউণ্ড। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে এই অর্থ সুভাষচন্দ্র ব্যক্তিগত ধার হিসেবে জার্মান সরকারের কাছ থেকে গ্রহণ করেন এই দেনা শোধ করার দায় ভারতবর্ষের ছিল না। জার্মান সরকারের এই সমস্ত সাহায্য সত্ত্বেও ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে কোনো ঘোষণা এখনও তাদের কাছ থেকে আদায় করা যায় নি।

১৯৪১ সালের অক্টোবর মাস থেকে স্বাধীন ভারত কেন্দ্র কাজ শুরু করে এবং ২ নভেম্বর কেন্দ্রের প্রথম সভা হয়। এই সভায় কয়েকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর মধ্যে চারটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এগুলি হল ১। জাতীয় অভিবাদন হিসেবে বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় ও আঞ্চলিক অভিবাদনের পরিবর্তে 'জয় হিন্দ' প্রবর্তন করা, ২। জাতির নেতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্যে সুভাষচন্দ্র বসুকে 'নেতাজী' সম্বোধন করা, ৩। জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে 'বন্দে মাতরম্' এর পরিবর্তে 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে' গানের প্রবর্তন করা, ৪। জাতীয় ভাষা হিসেবে হিন্দুস্থানীকে (হিন্দী + উর্দু) গ্রহণ করা এবং এর বর্ণমালা হিসেবে রোমান বর্ণমালা (A, B, C, D) গ্রহণ করা।[৬]

১৯৪১ সালের নভেম্বর মাস থেকে 'আজাদ হিন্দ রেডিও' একটি নিয়মিত বেতার প্রচার অনুষ্ঠান প্রচার করতে শুরু করে। প্রথমদিকে প্রতিদিন ৪৫ মিনিট অনুষ্ঠান প্রচার করা হত। প্রত্যেকদিন অনুষ্ঠানে নেতাজীর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে দেওয়া বেতার ভাষণ, যুদ্ধের খবর, রাজনৈতিক পর্যালোচনা এবং দেশাত্মবোধক গান থাকত। আজাদ হিন্দ রেডিওর সাফল্যে এর প্রচার সময় বাড়িয়ে দৈনিক তিন ঘণ্টা করা হয়। এ ছাড়া 'কংগ্রেস রেডিও' এবং 'আজাদ মুসলিম রেডিও' নামে আরো দুটি বেতার কেন্দ্র আংশিক অনুষ্ঠানের সময় স্থাপন করা হয়। 'আজাদ হিন্দ রেডিও' থেকে প্রত্যেকদিন ইংরেজী, হিন্দী, ফারসী, পুস্তু, তামিল, তেলেগু এবং একদিন অন্তর একদিন গুজরাটি ও মারাঠি ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার করা হত। বেতারের উপরে কোনো জার্মান নিয়ন্ত্রণ ছিল না এবং এর এঞ্জিনীয়ারিং কর্মী ও টাইপিস্টরা ছাড়া অন্য সব কর্মীরাই ভারতীয় ছিল।[৭]

নেতাজী উত্তর আফ্রিকায় ধৃত ব্রিটিশ ফৌজের ভারতীয় জওয়ানদের

৫। খাদ্য, বস্ত্র, ভাতা, ছুটি ও অন্যান্য সকল সুবিধে সুযোগের ব্যাপারে ভারতীয় বাহিনী জার্মান সৈন্যদের সমান মর্যাদা পাবে।[১০]

বাহিনীর পতাকা হিসেবে গেরুয়া, সাদা, সবুজের মধ্যে উদ্যত ব্যাঘ্র, এই প্রতীক ব্যবহার করা হয়। বাহিনীর নাম দেওয়া হয় আজাদ হিন্দ্ ফৌজ। ১৯৪১ সালের ২৫ ডিসেম্বর আজাদ হিন্দ্ ফৌজের যোদ্ধারা বার্লিন থেকে ফ্রাঙ্কেনবার্গ-এ (স্যাক্সনী প্রদেশ) ফৌজের কেন্দ্রীয় দফতরে যাত্রা করে।[১১] ফৌজের গোপন দফতরের মূল কেন্দ্র স্থাপিত হয় এন. জি. স্বামীর নেতৃত্বে ফ্রাঙ্কেনবার্গের মেসেরিৎস নামক জায়গায়। আজাদ হিন্দ ফৌজে যাঁরা যোগ দেন তাঁদের প্রত্যেককেই প্রথমে সৈন্য হিসেবে দেখা হত। ব্রিটিশ বাহিনীর কোনো পদমর্যাদা (rank) গ্রাহ্য করা হত না। আজাদ হিন্দ ফৌজ-এ প্রমাণিত যোগ্যতা ও কৃতিত্বই একমাত্র পদমর্যাদার মাপকাঠি বলে মনে করা হত। এর ফলে ব্রিটিশ বাহিনীর যুদ্ধবন্দী ভারতীয় নিম্নপদস্থ অফিসারদের মধ্যে অনেকে পদমর্যাদা হারাবার আশঙ্কায় আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদানে উৎসাহিত হননি।[১২]

ক্রমে বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকায় ফ্রাঙ্কেনবার্গ থেকে প্রশিক্ষণের জন্যে জওয়ানদের ডুবারিংজেনের কাছে কোনিগ্স্ব্রুক্-এ পাঠানো হয়। এই সময় নেতাজীর অনুকরণে ইতালীতে ইকবাল শেদাই নামে জনৈক ব্যক্তি **Centro Militare India** নামক বাহিনী গঠনের চেষ্টা করেন (এপ্রিল, ১৯৪২)। কিন্তু নেতৃত্বের অভাব, রাজনৈতিক শক্তি ও কূটনৈতিক জ্ঞানের অভাবে অচিরেই এই বাহিনী ভেঙে যায়।[১৩] অন্যদিকে নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ ক্রমে শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর-এ ফৌজের চারটি ব্যাটেলিয়ন গঠন করা হয়। নেতাজী হিন্দুস্থানী ভাষায় সৈনিক ব্যারাকগুলিতে বক্তৃতা দিতেন, ঐ জওয়ানদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতেন ও মাঝে মাঝেই আকস্মিকভাবে তাদের সঙ্গে পঙক্তি ভোজন করতেন। ব্রিটিশ বাহিনীতে শিখ, গোর্খা, গাড়োয়ালি, রাজপুত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের জন্যে ভাষা, ধর্ম প্রভৃতির ভিত্তিতে পৃথক রেজিমেন্ট তৈরি করা হত। আজাদ হিন্দ্ ফৌজে প্রকৃত জাতীয় মনোভাব বিকাশের উদ্দেশ্যে শিখ, মুসলমান, রাজপুত, জাঠ, গাড়োয়ালি অথবা মারাঠা সবাইকে নিয়েই মিশ্রিত বাহিনী তৈরি করা হত। নেতাজীর ইচ্ছা ক্রমে আজাদ হিন্দ্ ফৌজে

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আজাদ হিন্দ্ ফৌজ

টোকিও থেকে নেতাজী সিঙ্গাপুরে পৌঁছন ১৯৪৩ সালের ২ জুলাই। ৪ জুলাই ক্যাথে সিনেমায় রাসবিহারী বসু একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে উপস্থিত সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এর পরে তিনি বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে নেতাজীর হাতে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের সভাপতিত্বের দায়িত্বভার অর্পণ করেন। নেতাজী তাঁর বক্তৃতায় ভারতের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামের অঙ্গীকার ঘোষণা করেন।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সূত্রপাত নেতাজী আসবার আগেই হয়েছিল। মালয় অঞ্চলে যুদ্ধ করবার জন্য ৬০,০০০ ভারতীয় সৈন্যকে ব্রিটিশ বাহিনীর পক্ষ থেকে সমাবেশ করা হয়েছিল। মালয় যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনী পরাজিত হয়, ১৯৪২ এর ১৫ ফেব্রুয়ারি জাপানীদের হাতে ইঙ্গ-আমেরিকান ঘাঁটি সিঙ্গাপুরের পতন হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার ভারতীয় বিপ্লব আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা রাসবিহারী বসু তিন দশকের বেশী সময় জাপানে বাস করছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে চাপ দিবার সুযোগ নেবার জন্যে তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। জাপানী ব্ল্যাক ড্রাগন দলের নেতা অধ্যাপক তোয়ামা এবং সামরিক বিভাগের মেজর ফুজিওয়ারাকে তিনি এ সম্পর্কে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে বলেন। ভারতীয় বাহিনীর ক্যাপ্টেন মোহন সিং ও জাপানী সরকারকে একই অনুরোধ জানান। ব্রিটিশ বাহিনীর পক্ষ থেকে কর্নেল হান্ট ভারতীয় যুদ্ধবন্দী সেনাদের মেজর ফুজিওয়ারার হাতে সমর্পণ করেন। মেজর ফুজিওয়ারা ১৯৪২ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি এই সমস্ত সৈন্যদের আবার ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীর ১/১৪তম পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন মোহন সিং এর হাতে দায়িত্ব তুলে দেন। ক্যাপ্টেন মোহন সিং এই ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে এখানেই সর্বপ্রথম ভারতীয় জাতীয় সৈন্যদল গঠন করেন। সিঙ্গাপুর, মালয়, হংকং, জাভা, জাপান প্রভৃতি অঞ্চলের ভারতবাসীরা এর পরে রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে দুটি সম্মেলনের মাধ্যমে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ (Indian Independence League) গঠন করেন। ভারতীয় সৈন্যদলের পরিচালনার দায়িত্ব লীগের হাতে অর্পণ করা হয়। এরপরে জার্মানীতে নেতাজীকে পূর্ব-এশিয়ায় পাঠাবার অনুরোধ জানিয়ে

তারবার্তা প্রেরণ করা হয়। ১৯৪২ সালের ১ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিক ভাবে **Indian National Army** বা I. N. A. এর প্রতিষ্ঠা হয়। ৫৫,০০০ ভারতীয় সৈন্য ও অফিসার এই বাহিনীতে যোগ দেন। উক্ত অনুষ্ঠানে রাসবিহারী বসু মোহন সিংকে জেনারেল পদে উন্নীত করেন।

কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই জেনারেল মোহন সিং, কে. পি. কে মেনন, জি. কিউ. গিলানীর অসহযোগিতা এবং রাসবিহারী বসুর সঙ্গে তাঁদের প্রবল মতবিরোধ হওয়ায় তাঁরা কার্যকরী পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। রাসবিহারী বসু প্রাণপণ চেষ্টা করে সৈন্যবাহিনীকে কেবল টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হন।[১৭]

এর পরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর উপরে দায়িত্ব পড়ে বিবদমান, বিশৃঙ্খল এবং অকেজো আই. এন. এ এবং লীগকে পুনর্গঠিত করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষপর্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবার। ১৯৪৩ সালের ৪ জুলাই লীগের কার্যভার গ্রহণের পরের দিন নেতাজী প্রথম আই. এন. এ সৈনিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সময়ে তাঁর প্রতি প্রদর্শিত সামরিক সম্মানের প্রত্যুত্তরে তিনি যে ভাষণ দেন তাতে স্পষ্টভাবে আই. এন. এ র দায়িত্ব, কর্তব্য এবং কর্মপদ্ধতি তুলে ধরেন। এই বক্তৃতাতেই তিনি সৈন্যদের কাছে 'চলো দিল্লী' ধ্বনি উত্থাপন করেন।

৬ জুলাই জাপানের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো নেতাজীর সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজ পরিদর্শনে আসেন। এখানে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ও বেসামরিক জনতার সম্মুখে তিনি জাপান সরকারের পক্ষ থেকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন। এগুলি হল—১। ভারত সম্পর্কে জাপানের কোন ভূখণ্ডগত, সামরিক বা অর্থনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা (ambition) নেই, ২। যে কোন বিদেশী শক্তির আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়ে ভারত সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে, ৩। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাপান সবরকম সাহায্য দান করবে।[১৮] পূর্ব এশিয়ায় নেতাজী এইদিন থেকে 'জয়হিন্দ' সম্বোধন চালু করার জন্য সকলকে অনুরোধ জানান। তিনি বলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিদেশের মাটি থেকে সহায়তা করার দুটি প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রথমত, এর ফলে ভারতের সংগ্রামরত জনতা বুঝতে পারবে যে ভিতর এবং বাইরে থেকে সম্মিলিত আক্রমণে ব্রিটিশ আধিপত্য চূর্ণ হবেই জনগণের মনোবল এবং নৈতিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। দ্বিতীয়ত, ভারতের

স্বাধীনতা লাভের জন্যে বাইরে থেকে সামরিক সাহায্য লাভ একান্ত অপরিহার্য আই এন এ সে অভাব পূর্ণ করবে (৯ জুলাই এর ভাষণ)। ঐ বক্তৃতাতে তিনি আরও বলেন যে আই, এন, এ, ভারতের মাটিতে পৌঁছতে পারলেই সংগ্রামরত জনগণের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসতে সমর্থ হবে। এর ফলে ভারতে বিপ্লব শুরু হবে; সামরিক বাহিনীর মধ্যে দেখা দেবে ব্যাপক বিদ্রোহ এবং এই গণবিপ্লবেই ব্রিটিশ রাজত্ব ধ্বংস হবে—তার জন্যে জাপানের উপরে নির্ভর করতে হবে না। নেতাজীর বিখ্যাত স্লোগান **'Total Mobilisation for a Total War'** (সর্বাত্মক যুদ্ধের জন্যে চাই সর্বস্ব দান—ভাবার্থে) এই বক্তৃতাতেই প্রথম শোনা যায়। একটি নারী বাহিনী গঠনের কথা এখানেই তিনি প্রথম ঘোষণা করেন। তিনি আই, এন, এ-র জন্যে তিন লক্ষ সৈনিক এবং সংগ্রাম পরিচালনার জন্যে তিন কোটি ডলার দান করার আহ্বান জানান। সিঙ্গাপুরের এই সভায় ৬০ হাজার ভারতীয় ছাড়াও বহু মালয়ী এবং চীনা উপস্থিত ছিলেন।[১৯]

এর পরে নেতাজী ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের পুনর্গঠনে হাত দেন। লীগের কাজ ১৩টি বিভাগে ভাগ করা হয় এবং এক একজনকে এক এক বিভাগের প্রধান মন্ত্রিত্ব অর্পণ করা হয়। বিভাগগুলি হল ১। সাধারণ, ২। প্রচার ও জনসংযোগ, ৩। অর্থ, ৪। শিক্ষা, ৫। সমাজকল্যাণ, ৬। বাসস্থান ও যানবাহন, ৭। নারী, ৮। সরবরাহ, ৯। কর্মী সংগ্রহ, ১০। গোয়েন্দা, ১১। প্রশিক্ষণ, ১২। পুনর্গঠন, ১৩। সিংহল। লীগের বিভাগ থেকে বোঝা যায় যে এর কাজকর্ম ছিল প্রায় একটি সরকারের মতই, যদিও লীগের সরকারের মর্যাদা ছিল না, তবুও জাপান ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সমস্ত জাতীয় সরকারই এর অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। লীগের সদর দপ্তরে কর্মীদের ১৬টি স্তরে ভাগ করা হয়েছিল যার সঙ্গে ফৌজের পদবিন্যাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এই স্তর বিভাগ অনুযায়ী প্রত্যেক কর্মী ভাতা পেতেন।[২০]

১৯৪৩ সালের ২৫ অগস্ট নেতাজী আনুষ্ঠানিক ভাবে আই, এন, এ-র সর্বাধিনায়কের দায়িত্বভার নেন এবং আই, এন, এ-র নাম রাখেন 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ'—যেমন জার্মানীতে তিনি করেছিলেন। নেতাজী ফৌজের পূর্বতন গঠন কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করেন। তিনি আগেকার সামরিক ব্যুরো তুলে দেন। লেঃ কর্নেল (পরে মেজর জেনারেল) জে, কে, ভোঁসলেকে

ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজও যোগ্যতার সঙ্গে করা হতে থাকে।[২২] এ সময়, বর্মা এবং মালয় (থাইল্যান্ড) এর মোট ভারতীয় জনসংখ্যা ১৮,৫৫,০০০ হলেও[২৩] এই সময়ে ফৌজের অর্থ ও বস্ত্রের বিশেষ অসুবিধা দেখা দেয়। জাপানী সরকার কোনওদিনই আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে তিন ডিভিশন সৈন্যের জন্যে প্রয়োজনীয় অস্ত্রের চেয়ে বেশী অস্ত্র সরবরাহ করতে রাজী ছিল না। ফলে নেতাজীর তিনলক্ষ সৈন্য সংগ্রহের পরিকল্পনা কখনও বাস্তবে রূপ নেয়নি।[২৪]

ঝান্সি রাণী বাহিনী

যুদ্ধক্ষেত্রে ত্রাণ ও সেবার কাজে মেয়েরা আগে থেকেই নিযুক্ত ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও মেয়েদের ভূমিকা কম ছিল না, যদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা নেপথ্য থেকে সাহায্য করেছেন। কিন্তু নেতাজীর লক্ষ্য ছিল মেয়েদের নিয়ে সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা, যে বাহিনী সম্পূর্ণ সামরিক শিক্ষা নিয়ে লড়াই-এর মুখে ময়দানেও অবতীর্ণ হতে পারবে। এর ফলে মেয়েদের ভীরুতা, আত্মবিশ্বাসের অভাব প্রভৃতি দূর হবে এবং [illegible] মর্যাদাবোধ বাড়বে।

এই উদ্দেশ্যে নেতাজী ১৯৪৩ সালের ২২ অক্টোবর সিঙ্গাপুরে ঝান্সির রাণী বাহিনীর প্রথম সামরিক প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন। সিঙ্গাপুর বাহিনীতে ৫০০ জন মহিলা ছিলেন যাঁরা মালয়ালি, তামিল, তেলুগু, বাঙালী, গুর্খা, শিখ, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশের এবং বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। মেয়েদের মধ্যে অভাবনীয় উৎসাহ দেখা দেওয়ায় এর পরে ব্যাংকক এবং রেঙ্গুনে দুটো শিক্ষাশিবির খোলা হয়। লে. কর্নেল লক্ষ্মী স্বামীনাথন (সেহগল) ঝান্সি রাণী বাহিনীর অধিনায়িকা ছিলেন। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অন্যান্য পল্টন সদস্যদের মত এঁরা অনেকেই লড়াইয়ে অংশ নেন এবং শহীদ হন।[২৫]

অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্ সরকার

আমরা আগে দেখেছি যে জাপানের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও জার্মানী এবং ইতালী ভারতের স্বাধীনতা সংক্রান্ত ঘোষণা করতে রাজি না হওয়ায় নেতাজী ইওরোপে আজাদ্ ফৌজের সম্প্রসারণ ঘটাতে সক্ষম হননি এবং পূর্ব এশিয়ায় চলে আসেন। পূর্ব এশিয়াতে ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের কাজ এর আগে রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে অচলাবস্থায় এসে পৌঁছেছিল এবং আই. এন. এ র

আগেকার বিশৃঙ্খলার মূল কারণ ছিল ভারতীয় অস্থায়ী সরকারের অভাব। এর অবর্তমানে এখানকার ফৌজ ও লীগের নেতাদের জাপান, বর্মা প্রভৃতি রাষ্ট্রের সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল অস্বস্তিকর ও অনিয়ন্ত্রিত। তাঁরা ঐ সব সরকারের মন্ত্রীদের সমমর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন না, ফলে তাঁদের নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে যথেষ্ট অসুবিধে হত। তাছাড়া, বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত অস্থায়ী ভারত সরকারই কেবল প্রবাসী ভারতীয়দের পূর্ণ আনুগত্য দাবী করার বৈধ অধিকারসম্পন্ন ছিল।

আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার আগে পর্যন্ত নেতাজীকেও এ ধরনের অসুবিধের সামনে পড়তে হয়েছে। যেমন জাপ বাহিনীর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিনায়ক ফিল্ড মার্শাল কাউণ্ট তেরাউচি প্রথম থেকেই আজাদ হিন্দ ফৌজকে লড়াইয়ের মধ্যে ঢুকতে দেবার বিপক্ষে ছিলেন। ফৌজ মাত্র গোয়েন্দাগিরি এবং প্রচারের কাজ করবে এই ছিল তাঁর বক্তব্য। এর ফলে নেতাজীকে বলতে হয়েছিল যে, "জাপান আত্মোৎসর্গ করে যদি ভারতকে স্বাধীন করে তবে সে স্বাধীনতার চেয়ে পরাধীনতাও ভাল।"[২১] আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠার আগে এ সম্পর্কে জাপানী কর্তৃপক্ষকে বশে আনতে নেতাজীকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় এবং জাপানী সংযোগ দপ্তর হিকারি কিকান ও তার অধিকর্তা ইয়ামামোতোর সঙ্গে এর ফলে যথেষ্ট তিক্ততাও সৃষ্টি হয়।[২২]

অবশেষে ১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর সিঙ্গাপুরের বিখ্যাত ক্যাথে সিনেমাগৃহে একটি বর্ণাঢ্য সম্মেলনে 'আর্জি হুকুমত-ই-আজাদ হিন্দ' বা অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ছয়টি দেশ থেকে লীগ প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে যোগ দেন। অনুষ্ঠানের প্রথমে লীগের সাধারণ সম্পাদক লে. কর্নেল (পরে মেজর জেনারেল) এ. সি. চ্যাটার্জী লীগের বিগত সময়ের কাজের বিবরণী পেশ করেন। এরপর নেতাজী সরকার প্রতিষ্ঠার কথা ও মন্ত্রী পরিষদের নাম ঘোষণা করেন এবং আজাদ হিন্দ সরকারের ঘোষণা-পত্র পাঠ করেন। নিচে মন্ত্রিসভার পুরো বিবরণ দেওয়া হল:—

১। সুভাষচন্দ্র বসু — রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং যুদ্ধ দপ্তর ও বিদেশ মন্ত্রী, আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক।

২। ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন — নারী সংগঠন।

৩। এস. এ. আয়ার — প্রচার ও জনসংযোগ।

মুক্তাঞ্চলে প্রশাসন চালাবার সুবিধের জন্যে আগে থাকতে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। নভেম্বর মাসে বহু বিতর্কিত জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সংগীত সংক্রান্ত প্রশ্নের মীমাংসা হয়। পতাকা থাকে চরকা-বিহীন ত্রিবর্ণ—গেরুয়া, সাদা, সবুজ। জাতীয় সংগীত নতুন করে রচনা করতে হয়। 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটির সুর এবং কথার সঙ্গে কিছুটা সঙ্গতি রেখে 'শুভ সুখ চায়ন কি বরখা বরসে' গানটি রচনা এবং সুরারোপ করেন হুসেন। এই গৌরবময় কাজের জন্যে তাঁকে আজাদ হিন্দ্ সরকারের পক্ষ থেকে নেতাজী দশ হাজার ডলার পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেন।[৩১]

অক্টোবর মাস থেকে সংগ্রাম কাজের জন্যে আরো বেশী অর্থ সংগ্রহ দরকার হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ গোয়েন্দা অফিসার হিউ টয়ের লেখায় পাওয়া যায় যে এইসময়ে অর্থসংগ্রহ কঠিন হয়ে পড়ে এবং নেতাজীকে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের টাকা দেবার জন্যে জেলের ভয় দেখাতে হয় এবং স্বেচ্ছায় না দিলে যে জোর করে অর্থ আদায় করা হবে এ কথাও নাকি তিনি বলেন।[৩২] কিন্তু বিপরীত চিত্রও অভাব নেই। যেমন, গুজরাটি গোঁড়া চেট্টিয়ার সম্প্রদায়ের মন্দিরে নেতাজীকে সেই সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে দান গ্রহণের জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হলে নেতাজী জানান যে তাঁর সমস্ত ধর্মের এবং বর্ণের সহকর্মীকে মন্দিরে প্রবেশের অধিকার দিলে তবে তিনি এই দান নিতে যেতে পারেন। চেট্টিয়ার সম্প্রদায়ের মতো গোঁড়া সম্প্রদায়ের কাছে এটা ছিল অভাবনীয়। কিন্তু এ সম্পর্কে কোনো বলপ্রয়োগ করা হবে না এ কথা স্পষ্ট জানানো সত্ত্বেও তাঁরা নেতাজীর সঙ্গে সবাইকেই ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মন্দিরে একেবারে বিগ্রহের সামনে আমন্ত্রণ করেন এবং সেদিন থেকে সবার জন্যে মন্দির খুলে দেন।[৩৩] আজাদ হিন্দ্ সরকার অর্থ সংগ্রহের জন্যে বোর্ড অব ম্যানেজমেন্ট গঠন করে। ১৯৪৪ সনের প্রথম থেকে বোর্ডের কাছে ভারতীয়দের নিজেদের আয় ও সম্পদের পরিমাণ ঘোষণা করতে হত এবং এর ভিত্তিতে দশ থেকে পঁচিশ শতাংশ লেভি তাঁদের উপরে ধার্য করা হত।[৩৪] আজাদ হিন্দ্ ফৌজ যুদ্ধে যাত্রা করবার পরে প্রবাসী ভারতীয়রা যে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে দানের জন্যে আবার উন্মাদ হয়ে উঠেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় বর্মায়। হাবিব সাহেব এক কোটি তিন লাখ টাকা মূল্যের তাঁর যাবতীয় সম্পত্তিই শুধু আজাদ হিন্দের 'নেতাজী ফাণ্ড কমিটি'-কে দান করেন নি, নিজেকেও উৎসর্গ করেন আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সৈনিক হিসেবে। একই রকম ভাবে নাম করা যায় বি. ঘোষ, শ্রীমতী বেতাই,

নিজামী, বশির আহমেদ প্রমুখের যাঁরা সর্বস্ব দান করেছিলেন।[৩৪] এই উদাহরণগুলো দেবার অর্থ হল এই যে বিপ্লবী এবং স্বীকৃত সরকার হিসেবে ভারতীয়দের সম্পত্তির উপরে পূর্ণ অধিকার থাকলেও, খুব কম জায়গাতেই আজাদ হিন্দ্ সরকারের বলপূর্বক সেই অধিকারের প্রয়োগ করার দরকার হয়েছে। নেতাজী প্রবাসী ভারতীয়দের কাছে যে তিন কোটি ডলার চান তার দ্বিগুণেরও বেশী তাঁরা দিয়েছিলেন।

১৯৪৩ সনের নভেম্বর মাসে জাপান সরকারের আমন্ত্রণে টোকিওতে বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে দক্ষিণ পূর্ব এবং পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন সরকারের প্রধানদের সঙ্গে আজাদ হিন্দ সরকারের প্রধান নেতাজীকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। আজাদ হিন্দ্ সরকার বা ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারত কূটনৈতিক ভাবে যাতে কোনো ফাঁদে জড়িয়ে না পড়ে সেজন্য নেতাজী ঘোষণা করেন যে তিনি কেবল পর্যবেক্ষক হিসেবে এই সম্মেলনে যোগ দেবেন, প্রতিনিধি হিসেবে নয়। দ্বিতীয়ত, জাপান সরকারকে তিনি স্পষ্টই জানিয়ে দেন যে তিনি বর্তমান অবস্থায় তাঁর দেশের পক্ষ থেকে কোন ধরনের প্রতিশ্রুতি (**Commitment**) দেবেন না।[৩৬] অন্যান্য বহু ঘটনার মত এই ঘটনাও গভীর রাজনৈতিক তাৎপর্য বহন করে কারণ বিদেশী প্রভাবমুক্ত থেকে জাতীয় সংগ্রাম পরিচালনার ব্যাপারে নেতাজী যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন তা এর থেকে বোঝা যায়। এই সম্মেলনে জাপানী প্রধানমন্ত্রী তোজো তাঁর বক্তৃতায় স্বাধীন ভারতে নেতাজীই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হবেন—এ ধরনের কথা বলায় নেতাজী সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে স্বাধীন ভারতের সর্বেসর্বা কে হবে না হবে সেটা ভারতের জনগণই কেবল নির্ধারণ করবে, এটা তোজোর করে ঠিক দেবার ব্যাপার নয়।[৩৭]

এই সময়ে নেতাজী রাজনৈতিক এবং সামরিক দিক থেকে আরো কয়েকটি সাফল্য লাভ করেন। তিনি তেরাউচি কর্তৃক আজাদ হিন্দ ফৌজকে লড়তে না দেবার ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেন এবং ফৌজের লড়াই করবার, পুরো তিন ডিভিশন সৈন্যের জন্য অস্ত্র সরবরাহ করবার এবং আরো নানা ব্যাপারে জাপান সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসেন। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল দুটি ব্যাপার—জাপান কর্তৃক অধিকৃত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ আজাদ হিন্দ্ সরকারের হাতে সমর্পণ করা এবং যুক্তভাবে জাপানী ও আজাদী ফৌজ ভারতের সীমানা অতিক্রম করলে ঐ অঞ্চলসমূহ জাপানী অধিকারে

না গিয়ে আজাদ হিন্দ সরকারের অধিকারে আসবে। এ ব্যাপারে রাজী করানো।[৩৮] জাপানী স্থলবাহিনীর প্রধান জেনারেল সুগিয়ামার সঙ্গে নেতাজীর এই মর্মে চুক্তি হয় যে ১৯৪৪ সালের পরিকল্পিত আক্রমণে আজাদ হিন্দ্ বাহিনী জাপানী অপারেশনাল কমাণ্ডের নেতৃত্বে সহযোগী বাহিনী হিসেবে লড়াই করবে।

নভেম্বর মাসে নেতাজী আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ পরিদর্শনে যান। তিনি দ্বীপগুলির সার্বভৌম ক্ষমতা আজাদ হিন্দ্ সরকারের পক্ষে গ্রহণ করেন এবং বেসামরিক প্রশাসন চালাবার জন্য লে. কর্ণেল (পরে মেজর জেনারেল) এ ডি লোগনাথনকে দ্বীপপুঞ্জের চীফ কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করেন। সহকারী হিসেবে নিয়োগ করা হয় মেজর আলওয়াইকে। নেতাজী দ্বীপদুটির নতুন নামকরণ করেন। আন্দামানের নাম হয় শহীদ দ্বীপ, এবং নিকোবরের নাম হয় স্বরাজ দ্বীপ। কুখ্যাত সেলুলার জেলের বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়। আজাদ হিন্দ সরকারের চীফ কমিশনার দ্বীপপুঞ্জে নিম্নলিখিত বিভাগগুলির কাজ শুরু করে দেন ১। শিক্ষা, ২। খাদ্যোৎপাদন, ৩। হস্তশিল্প, ৪। প্রচার ও জনসংযোগ, ৫। বেসামরিক বিচার ব্যবস্থা ৬। নারী বিভাগ।[৩৯]

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে আসন্ন যুদ্ধের কাছে বেশী সংহত করার জন্যে সিঙ্গাপুর থেকে আজাদ হিন্দ্ সরকার এবং লীগের সদর দফতর বার্মার রেঙ্গুনে এগিয়ে নিয়ে আসা হয়। ফৌজের চতুর্থ গেরিলা রেজিমেন্ট সুভাষ ব্রিগেড এবং লে. কর্ণেল জামান কিয়ানীর নেতৃত্বে প্রথম ডিভিশন বার্মায় রওনা হয়। 'সুভাষ ব্রিগেড' নামটি নেতাজী পছন্দ না করায় পরে এটিকে শুধু 'প্রথম রেজিমেন্ট' বলা হত। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সুব্যবহারের ফলে বার্মায় আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সম্পর্কে বর্মী জনগণের বন্ধুত্বপূর্ণ এবং আশাব্যঞ্জক মনোভাব তৈরি হয়। এ ছাড়া নেতাজীর সভায় তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্যেও প্রচুর সাধারণ বর্মী মানুষের সমাগম হত। এর আগে বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে নেতাজী বর্মার রাষ্ট্রপ্রধান ডঃ বা ম-র হাতে বর্মী জনগণের কল্যাণের জন্যে পাঁচলক্ষ টাকা দান করেন।[৪০] শুধুমাত্র গ্রহীতা না থেকে সমান মর্যাদালাভের অন্যতম পথ হিসেবে তিনি আগে জাপান সরকারকেও ভারতবাসীর পক্ষ থেকে বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে দশটি সামরিক বিমান কেনার অর্থ দান করেন।[৪১]

নেতাজী ১৯৪৪ সালের জানুয়ারি মাসে সবচেয়ে বিপজ্জনক ও দুঃসাহসিক

কাজগুলির জন্যে প্রবাসী ভারতীয়দের কাছে আহ্বান জানান। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে পুরুষদের পাশাপাশি ঝাঁসি রানীবাহিনীর প্রচুর নারী এই 'সুইসাইড স্কোয়াড'-এ যোগ দিতে চান। এই স্কোয়াডের স্বেচ্ছাসেবক ও সেবিকারা শত্রুর ক্ষতিসাধনের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। এছাড়া, নেতাজীর আগ্রহে ছয় থেকে ষোল বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের নিয়ে 'বাল-সেনা' বাহিনী তৈরি হয়। দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের সংরক্ষিত বাহিনী হিসেবেই প্রধানত এদের তৈরি করা হত।[৪৭]

যুদ্ধ শুরু করার ঠিক আগে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ এবং সরকারকে বিভিন্ন রকম অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে জাপান সরকার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা জায়গায় ভারতীয়দের সংগ্রহ করে জাপ বাহিনীর সঙ্গে আরাকান ফ্রন্টে পাঠাবার চেষ্টা করে। আজাদ হিন্দ্ সরকারের এর সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না, বরং তাঁদের কিছুই না জানিয়ে এই ধরনের কাজ করা হয়। এই জাপ ভারতীয় বাহিনীকে 'এফ' বাহিনী বলা হত। আজাদ হিন্দ্ সরকারের পক্ষ থেকে জাপান সরকারের কাছে ভারতীয়দের ব্যবহার করার এ ধরনের চেষ্টার বিরুদ্ধে কড়া প্রতিবাদ করা হয়। এছাড়া ফৌজের নিজস্ব কামান বাহিনী, মর্টার প্রভৃতি কিছুই ছিল না। এমন কি অস্ত্রশস্ত্র সরঞ্জামও খুব কম ছিল। সামরিক বুটের অভাবে অনেকেই খালি পায়ে মার্চ করতে বাধ্য হন। গেরিলা বাহিনীর যোগাযোগের জন্যে টেলিফোন বা ওয়্যারলেসের কোন ব্যবস্থা করা যায়নি। এর ফলে ফৌজকে যুদ্ধে মারাত্মক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। শেষে আরও বলা যায় যে জাপানী সামরিক অধিকর্তা লেঃ জেনারেল কাওয়াবে আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে মূল যুদ্ধে অংশ নিতে দেওয়ার ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত বাধা সৃষ্টি করেছিলেন। নেতাজী দৃঢ়ভাবে জানান আজাদ হিন্দ্ ফৌজই আক্রমণের পুরোভাগে থাকবে এবং ভারত ভূখণ্ডে সমস্ত নারী-পুরুষের প্রাণ, মর্যাদা ও সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব কেবল আজাদ হিন্দ্ ফৌজের। কোন ভারতীয় অথবা জাপানী সৈন্য ভারত ভূখণ্ডে লুঠ বা ধর্ষণ করার চেষ্টা করলে তিনি ফৌজকে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করার অগ্রিম নির্দেশ দিয়ে রাখেন। জাপানী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় দুটি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে চুক্তি হয়। এগুলি হল :—

১। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ এবং জাপানী সৈন্যবাহিনীর সমমর্যাদা থাকবে এবং সামরিক সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও এই সমতা পালিত হবে।

২। সাধারণ রণকৌশলের ভিত্তিতে দুটি বাহিনী কাজ করবে।

৩। যুদ্ধক্ষেত্রে মিলিত কমান্ডের প্রধান থাকবেন বয়োজ্যেষ্ঠ মেজর জেনারেল যথাযোগ্যতা। কিন্তু আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ইউনিট এবং উপদলগুলি কেবল নিজেদের অফিসারদের নির্দেশে চলবে, অন্য সকল ক্ষেত্রে জাপানের কোনো হস্তক্ষেপ চলবে না।

৪। ফৌজের নিম্নতম বিভাগ হবে ব্যাটেলিয়ন, কেবলমাত্র গোয়েন্দা ও প্রচার বিভাগের বিভাজন অন্যরকম হবে।

৫। ফৌজের লোকেরা 'আই. এন. এ. অ্যাক্ট'-এর অধীনে থাকবেন, জাপানী সামরিক আইন বা পুলিসী ব্যবস্থা তাদের উপরে বলবৎ হবে না।

৬। মুক্ত ভূখণ্ডগুলি আজাদ হিন্দ্ ফৌজের হাতে অর্পণ করা হবে।

৭। স্বাধীনভাবে লড়াইয়ের জন্যে ফৌজ আলাদা ক্ষেত্র পাবে।

৮। ভারত ভূখণ্ডে কেবলমাত্র ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকাই উড়বে।

৯। কলকাতার উপরে নির্বিচারে বোমা বর্ষণ করা চলবে না।

১০। কোনো জাপানী অথবা ভারতীয় সৈন্যকে ধর্ষণরত দেখলে তৎক্ষণাৎ তাকে গুলি করা হবে।[৪১]

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের লড়াই—আরাকান, কালাদান, হাকা ও ফালাম, কোহিমা, ইম্ফল প্রভৃতি রণাঙ্গনে ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের প্রচণ্ড লড়াই হয় এবং আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ভারতের মাটিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। **আরাকান** রণাঙ্গনে ব্রিটিশ বাহিনী অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। এখানকার লড়াইয়ে লেঃ কর্নেল মিশ্র এবং মেজর মেহের দাস অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করেন। ব্রিটিশ সপ্তম ডিভিশন সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় এবং বুথিয়াডং অধিকৃত হয়। লেঃ হরি সিং বীরত্বের জন্যে শের-ই-হিন্দ্ উপাধিতে ভূষিত হন। **কালাদান** রণাঙ্গনে মেজর রাতুরির (সর্দার-ই-জং) বাহিনীর বীরত্বে ফৌজ পালেৎওয়া এবং দালেৎমে দখল করে নেয়। এই জায়গাগুলি ছিল চট্টগ্রাম সীমান্তের কাছে এবং এখান থেকে ভারত ভূখণ্ড মাত্র চল্লিশ মাইল দূর ছিল। এর পরে এই বাহিনী আরাকানের অন্তর্গত মাওডক ঘাঁটি দখল করে ভারতে পদার্পণ করে (মে ১৯৪৪)। মাওডক আক্রমণে ক্যাপ্টেন সুরযমল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। আসাম সীমান্তে **হাকা এবং ফালাম** রণাঙ্গন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই অঞ্চল ছিল কালেওয়া থেকে টামু এবং কালেওয়া থেকে টিডিমের সংযোগপথ। এই দুটি জায়গাই সহজে ভারতের মধ্যে প্রবেশপথ। টিডিমের পশ্চিমে আইজল

এবং বিষেণপুরের উত্তর পশ্চিমে শিলচর—এই ছটো গুরুত্বপূর্ণ শহর রয়েছে। এই রণাঙ্গনে রাস্তা অত্যন্ত খারাপ ছিল এবং পরিবহণের জন্যে কোনো পশুও ছিল না। বাহিনীর যাবতীয় সরঞ্জাম সৈনিকদের নিজেদেরই বহন করতে হয়েছে। যতদিন পর্যন্ত এই অঞ্চল জাপানী সৈন্য বাহিনীর হাতে ছিল ততদিন পর্যন্ত বার্মা সীমান্তের অভ্যন্তরে ব্রিটিশবাহিনী ছিল। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ এই এলাকার দখল নেবার পরেই শত্রুকে বার্মা ছেড়ে ভারতের অভ্যন্তরে পশ্চাদপসরণ করতে হয়েছিল। লেঃ গেহ্না সিং এবং মেজর মেহবুব আমেদ এই রণাঙ্গনে অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে ছটি ঘাঁটি দখল করেন।

ভারতের অভ্যন্তরে **কোহিমায়** আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ১৯৪৪ সালের মার্চের প্রথমেই ঢুকে পড়ে ক্যাপ্টেন মঘর সিং, অমর সিং এবং দলপতি সিংহের পরিচালনায়। মুক্তাঞ্চলের প্রশাসন ভার গ্রহণ করে আজাদ হিন্দ্ সরকারের পক্ষে আজাদ হিন্দ দল। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ও জাপানী বাহিনীর মিলিত আক্রমণে কোহিমার পরে উখরুল এবং তারপরে ডিমাপুর দখল করা সম্পন্ন হয়। কিন্তু জাপানী রণকৌশলগত ত্রুটি, সাংঘাতিক খাদ্যাভাব, প্রচণ্ড পাহাড়ী বর্ষার ফলে সরবরাহের ক্ষেত্রে বিপর্যস্ত অবস্থা এবং শত্রুপক্ষের শক্তিবৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে মিলিত বাহিনী শীঘ্র দুর্বল হয়ে পড়ে। এছাড়া জাপানীদের দুর্ব্যবহার ও সংরক্ষণের পূর্ব প্রধান প্রভৃতির ফলে পাহাড়ী চীন এবং নাগা উপজাতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন নাগারাও জাপানী দুর্ব্যবহারের শিকার হয়। কোনরকম খাবার না থাকায় ফৌজের সৈনিকদের এখানে ঘাস সিদ্ধ করেও খেতে হয়েছে। এখানে জাপানী বাহিনীর সঙ্গে যে শুধু নাগাদেরই সম্পর্ক খারাপ ছিল তা নয়, আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সঙ্গেও তারা দুর্ব্যবহার করতে থাকে, যার ফলে কখনো কখনো সংঘর্ষ হবারও উপক্রম দেখা দেয়। যুদ্ধ শুরু হবার আগে নেতাজী ফৌজের উদ্দেশ্যে বিদায়ী ভাষণে বলেছিলেন, "আপনারা যদি কখনো দেখেন যে জাপানীরা ভারতের উপর কোনদিক থেকে আধিপত্য বিস্তার করতে চাইছে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে সোজাসুজি দাঁড়াবেন এবং যেমন সাংঘাতিক ভাবে আপনারা ব্রিটিশের সঙ্গে লড়বেন, তেমন ভাবেই তাদের সঙ্গেও লড়বেন।"

ইম্ফল রণাঙ্গনেই আজাদ হিন্দ্ ফৌজ সবচেয়ে আগে ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশ করে এবং ১৯৪৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ভারতের মাটিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। মোরে এবং টামু দখল করা হয় এবং ব্রিটিশবাহিনী মণিপুরে পলায়ন করে। এই রণাঙ্গনে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ও নেতাজীর রণকৌশলগত ভুলের জন্যে আমাদ

কিয়ানীর অধীনস্থ ১ম ডিভিশনের সঙ্গে শাহনওয়াজ খানের অধীনস্থ ১ম ব্রিগেডকে একসঙ্গে মেলানো হয়নি। কর্নেল মালিকের নেতৃত্বে একটি ছোট সামরিক দল বিষেণপুর দখল করে নেয়। এর পর ৩০০০ সুসজ্জিত ব্রিটিশ সৈন্যের বিরুদ্ধে ৬০০ আজাদী সৈনিক নামমাত্র রেশন এবং অস্ত্র নিয়ে অবিশ্বাস্য লড়াই চালিয়ে ছাইখাল, খিগা, খংজোল, পালেল সামরিক বিমানঘাঁটি দখল করে। উপযুক্ত সরবরাহের অভাবে পালেল দখল করেও দীর্ঘদিন দখলে রাখা সম্ভবপর হবে না বুঝে বিমানঘাঁটি এবং সামরিক বিমানগুলি ধ্বংস করে দেওয়া হয়। এই যুদ্ধগুলিতে মেজর প্রীতম সিং (সর্দার ইশক্), ক্যাপ্টেন সাধু সিং, লে: লাল সিং, মেজর (ডা:) আকবর আলী শাহ্, ক্যাপ্টেন খাঁ ও লে: মনসুখলাল, লে: অজায়েব সিং প্রমুখ অসামান্য বীরত্বের নিদর্শন রাখেন।

ইম্ফল রণাঙ্গনের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, হল মুক্তাঞ্চলে 'আজাদ হিন্দের প্রশাসন। এই অঞ্চলে নাগারা বিশেষ করে এবং কাছাড়ীরাও ফৌজকে সবরকম সাহায্য করেন। তাঁরা নবনির্মিত মুক্তাঞ্চলে আজাদ হিন্দের প্রশাসনে এঁরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন এবং আগ্রহের সঙ্গে তাতে অংশ নিতেন। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নিয়ন্ত্রণে অংশগ্রাহীরা কোনো দুর্ব্যবহার করার সুযোগ পেত না। যখন খাদ্যের অভাবে পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তখন এঁরা আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে তা করতে বারণ করেন এবং নিজেরা যতদূর সম্ভব খাদ্য জোগাড় করে দেবার চেষ্টা করেন।[৪৪]

যুদ্ধের অগ্রগতির ফলে ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসে আজাদ হিন্দ্ সরকার, ফৌজ এবং লীগের অগ্রবর্তী সদর দপ্তর স্থাপন করা হয় মেমিওতে। এই সময়ে মুক্তাঞ্চলের গ্রামবাসীরা দেওয়ানী ও ফৌজদারি বিষয়ের নিষ্পত্তির জন্যে সবসময়েই ফৌজের কাছে আসত, আজাদ হিন্দ্ সরকারকে তারা প্রিয় 'নেতাজী সরকার' নামে ডাকত। এসব কারণে বেসামরিক প্রশাসন ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালানোর জন্য আজাদ হিন্দ্ দলকে দ্রুত মুক্তাঞ্চলে পাঠানোর চেষ্টা হয়। যদিও পরিবহণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার শোচনীয় অবনতির ফলে সময়মত তাঁদের পাঠানো যায় নি। একই প্রয়োজনে বেসামরিক প্রশাসনিক আইন ও নির্দেশাবলী তৈরি করা হয়। বিস্তারিত প্রশাসনিক বিভাগে গ্রামকে একক (unit) ধরা হয় এবং গ্রামের প্রশাসনিক ও উন্নয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয় নির্বাচিত 'মণ্ডল' বা 'মুখিয়া'র হাতে ; 'মুখিয়া' এবং 'বিশওয়া'র (কুড়িটি পরিবারের উন্নয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত) গ্রামের পঞ্চায়েতের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে। প্রত্যেকের কাজ ও ক্ষমতার প্রক্রিয়ার স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। দশটি গ্রাম মিলে একটি 'দশ গাঁও' তৈরি

হবে এবং প্রতি একজন আধিকারিক থাকবেন। পাঁচটি পর্যন্ত পল্লী নিয়ে একটি 'থানা' বা গ্রুপ তৈরি হবে এবং একজন থানা আধিকারিক থাকবেন। অনধিক পাঁচটি থানা নিয়ে তৈরি হবে মহকুমা যার প্রশাসন চালাবেন মহকুমার আধিকারিক। অনধিক পাঁচটি মহকুমা নিয়ে জেলা তৈরি হবে এবং জেলা আধিকারিকদের সমন্বয় করবার দায়িত্ব থাকবে মুক্তাঞ্চলের আজাদ হিন্দ্ অস্থায়ী সরকারের সদর দপ্তরে অবস্থিত স্বরাষ্ট্র সচিবের হাতে।[৪৫] মনে রাখতে হবে যে এই প্রশাসনিক ব্যবস্থা যুদ্ধ চলাকালীন অস্থায়ী অবস্থার জন্যে।

এই সময়ে আজাদ হিন্দ্ সরকার স্বাধীনভাবে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য এক কোটি টাকা মূলধন নিয়ে 'আজাদ হিন্দ্ জাতীয় ব্যাঙ্ক' প্রতিষ্ঠা করে। ডি. এন. ভাদুড়ীকে এর ম্যানেজিং সেক্রেটারির পদে নিয়োগ করা হয়। সরকারের পক্ষ থেকে নানা অঙ্কের নিজস্ব কারেন্সি নোট ছাপতে দেওয়া হয়। ডাকটিকিটও বিভিন্ন দামে বাজারে ছাড়া হয়। সরবরাহ বিভাগকে ঢেলে সাজানো হয় ও একটি রাজস্ব 'বোর্ড'ও গঠন করা হয়। ফৌজের জয়লাভের ফলে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয়দের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। বর্মীদের সমর্থন ও উৎসাহও বেশ লক্ষ্যণীয় ছিল। এছাড়া মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং, ও আধুনিক চাষ প্রভৃতিতে প্রশিক্ষণ দান শুরু হয় এবং যুদ্ধের প্রয়োজনে নিজস্ব উৎপাদন শুরু করে দেওয়া হয়।[৪৬]

পশ্চাদপসরণ —বর্ষাকাল এলে আসামের সীমান্ত অঞ্চলে চলাফেরা করা অসম্ভব হয়ে উঠতে থাকে। খাবার, অস্ত্র এবং গোলাবারুদের যোগান কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। সাংঘাতিকভাবে উদরাময় এবং ম্যালেরিয়া ফৌজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত এবং অসুস্থ সৈনিকরা পূর্ণ মাত্রায় আক্রমণ চালাবার জন্যে উৎসুক ছিল কিন্তু ইম্ফল দখল করতে পারলেও দীর্ঘদিন রক্ষা করা যেত না। কারণ ইঙ্গ মার্কিন বিমানবাহিনী একটানা আক্রমণ চালাচ্ছিল এবং তাদের বাহিনীর জন্যে নতুন রসদ সরবরাহ করছিল। অপরদিকে কোনো জাপানী বিমান রণাঙ্গনে ছিল না। এর ফলে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়, যদিও এর ফলে সৈনিকদের মধ্যে যথেষ্ট বিক্ষোভ সৃষ্টি হয় এবং কেউ কেউ আত্মহত্যা করেন। দীর্ঘ পথ পশ্চাদপসরণের সময়ে ফৌজকে শত্রুসৈন্যের আক্রমণ, বন্যা, মড়ক, বিষাক্ত সাপের কামড় প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়।

অক্টোবর মাসে যুদ্ধ বিরতি নেওয়া এবং পুনরাক্রমণের প্রস্তুতি চালাবার জন্যে ১২ জনকে নিয়ে নেতাজী একটি 'যুদ্ধ পরিষদ' গঠন করেন। লড়াইয়ের এই

পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাপানীদের বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা, দুর্ব্যবহার, ভুল তথ্য সরবরাহ করা প্রভৃতি বিষয়ে খোলাখুলি বোঝাপড়ার জন্যে নেতাজী সামরিক সঙ্গীদের নিয়ে টোকিও যান। এখানে নতুন প্রধানমন্ত্রী জেনারেল কোইসো, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মামোরু শিগেমিৎসু প্রমুখের সঙ্গে অনেকগুলো বৈঠক হয় এবং নতুন সহযোগিতার কথা ঘোষণা করা হয়। এর সঙ্গে আবারও জাপান সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে ভারতে রাজনৈতিক, সামরিক, অথবা অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের কোনো ইচ্ছা জাপানের নেই এবং আজাদ হিন্দ্ সরকারকে প্রদত্ত সাহায্যের জন্যে কোনো বিশেষ সুযোগও সে দাবী করে না। এই আলোচনার ফলে জাপানী সংযোগরক্ষাকারী দপ্তর হিকারি কিকানকে অবলুপ্ত করে দেওয়া হয়।[৬৭]

কিন্তু শত্রু উত্তর দিক থেকে অতিদ্রুত প্রবল আক্রমণ শুরু করে এবং মিঙ্গিয়ান-এর কাছে ইরাবতী নদী অতিক্রম করায় যুদ্ধের অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়। এই সময়ে ২য় ডিভিশন থেকে চারজন প্রবীণ অফিসার শত্রুপক্ষে যোগ দেন। তবুও ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে টাউঙ্গজিন, জাউজন প্রভৃতি জায়গায় লড়াইয়ে ফৌজের সৈনিকরা প্রবল মনোবল, সাহস ও শৌর্যের প্রমাণ দেন।[৬৮]

আজাদ হিন্দ্ ফৌজ প্রথম থেকে জাপানী বাহিনীকে তার উপরে কোন সুযোগ নিতে দেয়নি, এবং ভারত ভূখণ্ডে তারা যাতে আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে ফৌজ সে ব্যাপারে সতর্ক ছিল। কিন্তু বর্মী বাহিনী প্রথম থেকে সুযোগ দিতে দেওয়ায় জাপানীরা বর্মীদের প্রতি ক্রমে দুর্ব্যবহার বাড়াতে থাকে। এর ফলে ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে বর্মী প্রতিরক্ষাবাহিনীর মধ্যে কমিউনিস্টদের দ্বারা প্রভাবিত মেজর জেনারেল আউঙ সাং-এর নেতৃত্বে জাপ বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়। জাপান এই বিদ্রোহ দমনের জন্যে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সাহায্য চাইলে আজাদ হিন্দ্ সরকার দৃঢ়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করে। এই বিদ্রোহের ফলে জাপানী আধিপত্য বার্মা দেশে নির্মূল হয়। কিন্তু এর ফলে ফৌজের কোনো অসুবিধে হয়নি বরং বর্মীবাহিনীর সঙ্গে তাদের মৈত্রী শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল।[৬৯]

১৯৪৫ সালের ২৯ এপ্রিল রেঙ্গুন আবার ব্রিটিশবাহিনীর দখলে চলে যায়। এর আগে যখন বোঝা গিয়ে ছিল যে জাপ বাহিনী রেঙ্গুন ছেড়ে পিছু হটবে, তখন আজাদ হিন্দ্ **মন্ত্রিসভার** জরুরী বৈঠকে স্থির হয় নেতাজী রেঙ্গুন ত্যাগ করে মালয়ে ফিরে যাবেন, সেখানে ৩য় ডিভিশনকে লড়াইয়ের জন্যে তৈরি করবেন এবং নতুন করে বেসামরিক ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ শুরু করার ব্যবস্থা করবেন। যদি অবস্থা

আরো খারাপ হয়, নেতাজী বিশেষ কয়েকজন অফিসার এবং একটি পুরো রেজিমেন্ট সমেত চীনে আশ্রয় নেবেন এবং জাপান যদি আত্মসমর্পণ করে তবে সোভিয়েত ইউনিয়নে যাবার চেষ্টা করবেন। নেতাজীর স্পষ্ট ধারণা ছিল যুদ্ধে মিত্রপক্ষের জয় হলেও ব্রিটেনের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য রকম হ্রাস পাবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের মূল কেন্দ্রে পরিণত হবে। দ্বিতীয়ত, এই যুদ্ধ শেষ হবার কিছুদিনের মধ্যেই যে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধরত দুটি শিবিরে সম্পূর্ণ ভাগ হয়ে যাবে এবং তারা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করবে—এরকম ধারণা নেতাজীর ছিল। এর জন্যেই তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে যেতে চাইছিলেন।[৫০] নেতাজীর দ্বি-মেরু বিশ্বব্যবস্থা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্দৃষ্টি সঠিক ছিল। কিন্তু তখনও পরমাণু অস্ত্রের প্রসার না হওয়ায় ঠাণ্ডা লড়াই সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল না।

২৯ এপ্রিল রেঙ্গুনের পতনের আগে পর্যন্ত মেজর জেনারেল লোগনাথন কর্ণেল আরশাদের বাহিনী নিয়ে এখানে থেকে যান এবং বার্মার রাষ্ট্রপতি ডঃ বা ম অন্তর্বর্তীকালে রেঙ্গুনের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে তাঁর শরণাপন্ন হন। কর্ণেল আরশাদ যথোপযুক্ত ভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন।[৫১]

এরপর নেতাজী ও তাঁর বাহিনী পায়ে হেঁটে সিতাং নদীর পশ্চিমপ্রান্তে আসেন এবং নিরন্তর আক্রমণের মধ্যে নদী পার হয়ে মৌলমিনে পৌঁছন। প্রাংকাশি হয়ে মে মাসের শেষে তাঁরা ব্যাংকক পৌঁছন। এখান থেকে পুরো ফৌজের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্যে নেতাজী সমগ্র মালয় ব্যাপকভাবে সফর করেন। নেতাজী সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজের শহীদদের স্মরণে জুলাই মাসে শহীদ বেদীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বেদীটি আগস্ট মাসে তৈরি শেষ হয়। এর রূপকার ছিলেন কর্ণেল স্ট্রাচি। ব্রিটিশ ফৌজ যখন আবার সিঙ্গাপুর দখল করে তখন ডিনামাইট দিয়ে নৃশংসভাবে এই শহীদবেদীটি ধ্বংস করে দেয়। তাদের ভয় ছিল এই শহীদবেদী দেখলে ব্রিটিশ ফৌজের ভারতীয় সৈন্যরা বিদ্রোহী হতে পারে। শহীদবেদীটি ধ্বংস করার পরে একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটে। আজাদ হিন্দ ফৌজের আত্মসমর্পণের পরও প্রত্যেকদিন এই ধ্বংসস্তূপের উপরে বেনামী জনগণ পুষ্পার্ঘ অর্পণ করতেন। এই জনগণ শুধু ভারতীয় নয়—প্রচুর চীনা এবং মালয়ী জনগণও এই কাজ নিয়মিত করতেন বলে জানা যায়। কোনভাবেই ব্রিটিশ সেনাবাহিনী এটা বন্ধ করতে পারেনি। এই ঘটনার মাধ্যমে স্থানীয় চীনাসমাজ ভারতীয়দের অনেক ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।[৫২]

সিঙ্গাপুর থেকে নেতাজী ভারতীয় জনগণের উদ্দেশে ১৮, ১৯, ২০ এবং ২৬ জুনে প্রচণ্ড বেতার ভাষণে পাকিস্তান প্রস্তাব তথা দেশভাগ করার চেষ্টা এবং ওয়াভেলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার জন্যে সর্বশক্তি আবেদন জানান। সায়গন থেকেও এ. সি চ্যাটার্জী এবং এস. এ. আয়ার আজাদ হিন্দ্ সরকারের পক্ষে নেতাজী এবং ফৌজের পুরো একটি ব্রিগেডকে চীনে পাঠাবার এবং রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে শেষ চেষ্টা করেন। একই সঙ্গে শেষবারের মতো অর্থসংগ্রহ করার জন্যে চেষ্টা করা হয়। ১৯৪৫ সালের ১০ অগস্ট জাপান চূড়ান্তভাবে আত্মসমর্পণ করে। নেতাজী ১৩ অগস্ট এ সি চ্যাটার্জীকে সিঙ্গাপুর প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেন। নির্দেশ অনুযায়ী চ্যাটার্জী চারকোটি ডলার মূল্যের সম্পদ সমেত সিঙ্গাপুরে এসে পৌঁছন। কিন্তু পথে কয়েকঘণ্টা অস্বাভাবিক দেরি হওয়ার জন্যে নেতাজীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি কারণ নেতাজী অল্প আগেই ব্যাংকক চলে যান। সেখান থেকে সায়গনে পৌঁছে তিনি ১৮ অগস্ট অজ্ঞাত কোনো জায়গায় চলে যান। যদিও তিনি তাঁর সঙ্গে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্ সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী এবং উপদেষ্টাকে নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু শেষমুহূর্তে জাপানী কর্তৃপক্ষ তাঁকে জানায় যে বিমানে তিনি ছাড়া আর মাত্র একজনের বসবার জায়গা আছে। ফলে নেতাজী কর্ণেল হবিবুর রহমানকে সঙ্গে নেন। এর পরে তাঁর আর কোনো খবর পাওয়া যায় নি এবং ২২ অগস্ট টোকিও বেতার থেকে ঘোষণা করা হয় যে নেতাজী বিমান দুর্ঘটনায় ১৮ অগস্ট মারা গেছেন। কিন্তু তখন এই খবর আজাদ হিন্দ বাহিনীর কোনো অফিসার বা আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রীরা বিশ্বাস করেন নি।[৫৩]

১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে মোটামুটি সমস্ত আজাদ হিন্দ্ মন্ত্রী ও সামরিক অফিসার, জওয়ানেরা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নানা দেশে আত্মসমর্পণ করেন। এর পরে এঁদের ভারতে আনা হয় এবং লালকেল্লায় মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান, কর্ণেল পি. কে. সেহ্গল, লেঃ কর্ণেল জি. এস. ধিলোঁ এবং আরো অনেকের ঐতিহাসিক বিচার ভারতীয় জনগণকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করে। জওহরলাল নেহরু প্রমুখ কংগ্রেস নেতারা তাঁদের সমর্থনে এগিয়ে আসেন এবং ভারতীয় নৌ-বাহিনীর মধ্যে এই বিচারের ঘটনার প্রেরণায় বিদ্রোহ দেখা দেয়।[৫৪]

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ব্যর্থ হবার কারণ

ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর অধীনে প্রথম আই. এন. এ. ভেঙে যাবার কারণ ছিল আভ্যন্তর বিরোধ, নেতৃত্বের অভাব এবং পারস্পরিক অবিশ্বাস প্রভৃতি। কিন্তু

নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ আগের থেকে অনেক বেশী সংবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এবং কিছুটা সফল হলেও যে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছিল তার নিম্নলিখিত কারণগুলি ছিল—

জাপানী রণকৌশল ছিল ত্রুটিপূর্ণ। যুদ্ধের প্রথম পর্বে আরাকান পাহাড় এবং কালাদান উপত্যকায় জাপান ব্রিটিশ সৈন্য ডিভিশনকে পর্যুদস্ত করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্বে কোহিমা এবং তৃতীয় পর্যায়ে ইম্ফল এলাকায় লড়াইয়ের ব্যাপারে জাপানের পুরো হিসেবেই ছিল মারাত্মক ত্রুটি। জাপ সেনাপতিরা সব সময়েই ঝটিকা আক্রমণ (blitz) পছন্দ করতেন। এই কারণে কোহিমা ও ইম্ফলের যুদ্ধে সৈন্যদের সঙ্গে কেবল দশ দিনের রেশন দেওয়া হয়েছিল। সেনাপতিরা শত্রুকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা করেছিলেন। ভুল সামরিক তথ্য এবং অনুমানের ফলে তাঁদের ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে শত্রুর শক্তি বেশি হবে না। কিন্তু শত্রুপক্ষের হাতে পর্যাপ্ত রেশন ছিল—তা দিয়ে দশদিনের অনেক বেশী দিন লড়াই করা সম্ভবপর ছিল।

শত্রুপক্ষের পর্যাপ্ত সামরিক বিমানও ছিল। এর ফলে বেশী শক্তিশালী শত্রুপক্ষকে যখন জাপবাহিনী ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মিলিত সৈন্যদল চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে আক্রমণ করে, তখন শত্রুপক্ষ মরিয়া হয়ে সবলে লড়াই করে। তাদের পিছু হটবার পথ না থাকার জন্যই তারা এভাবে লড়াই করে। পক্ষান্তরে যদি তাদের পিছু হটবার পথ খোলা রাখা হত, তবে তাদের পালাতে দিয়ে এবং পিছু ধাওয়া করে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ও জাপ বাহিনী ভারতের আরও ভিতরে ঢুকে পড়তে পারতো। বিশেষতঃ বর্ষাকাল শুরু হবার আগে তা হলে যুদ্ধের ফল অন্যরকম হবার সুযোগ থাকত।

এছাড়া এই দুটি রণাঙ্গনে সামরিক বিমান না পাওয়ার কারণ জাপানী সেনাপতিদের মধ্যে মতবিরোধ। জাপ বাহিনীর প্রধান সেনাপতিদের মধ্যে জেনারেল ইয়ামাশিতো এবং জেনারেল কাওয়াবে ভারতীয় রণাঙ্গনকে কখনও গুরুত্ব দেননি। এঁদের মধ্যে প্রথমজন ফিলিপাইনস্ রণাঙ্গনে বেশীর ভাগ জাপানী সামরিক বিমানকে নিজের এক্তিয়ারে দখল করে রাখেন। অপরদিকে জেনারেল তোজো এবং লেঃ জেনারেল মুতাগুচি ভারত রণাঙ্গনের সামগ্রিক গুরুত্ব বুঝেছিলেন। কিন্তু তাঁরা বিমান সাহায্য ও অন্যান্য ব্যাপারে এই রণাঙ্গনে অনুসৃত রণকৌশলকে প্রভাবিত করতে পারেননি। আগে যে সামরিক ভুল তথ্যের কথা বলা হয়েছে তা জাপ সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের কাছ থেকে এই

বিভাগ বিভিন্ন সময়েই ভুল তথ্য সরবরাহ করে যুদ্ধের দারুণ ক্ষতি করে। সামরিক গোয়েন্দা দপ্তরের কর্তা লেঃ কর্নেল ফুজিওয়ারা নিজেও পরে একথা স্বীকার করেন। এসব কারণেই চট্টগ্রাম, কালাদান, কোহিমা প্রভৃতি রণাঙ্গনে জাপ ও আজাদ বাহিনী পরাজিত হয়।

জাপানী সরবরাহ ব্যবস্থাও ছিল বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ। জাপ ও আজাদ হিন্দ ফৌজের মিলিত বাহিনীর জন্যে যত রসদপত্র প্রয়োজন তার থেকে অনেক কম করে জাপান সরকার হিসেব করেছিল। এছাড়া তাদের ধারণা ছিল যে ইম্ফল রণাঙ্গনে জিতে মিলিত বাহিনী শত্রুপক্ষের কাছ থেকে প্রচুর রসদ দখল করবে। আত্মম্ভরিতা এবং বাস্তবতা বোধের অভাবের জন্য এরকম সম্পূর্ণ অনিশ্চিত ব্যাপারের উপরে নির্ভর করা হয়েছিল। কল্পনাশ্রয়ী ধারণার মাশুল মিলিত বাহিনীকে পরাজয়ের মাধ্যমে দিতে হয়েছে।

জাপানী পরিবহণ ব্যবস্থাও খারাপ ছিল। পরিবহণের গাড়ি এবং যন্ত্রাংশ অপ্রতুল ছিল। পাহাড়ী অঞ্চলের উপযুক্ত কোন পরিবহণ ছিল না।

ব্যর্থতার অন্যতম কারণ ছিল সামরিক সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় রাস্তাঘাট তৈরি করা এবং ওয়্যারলেস এবং টেলিফোন সরবরাহ করার ব্যাপারে জাপানী কর্তৃপক্ষ ফৌজকে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সহায়তা করেনি। আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং সরকারের একটি বড় কৌশলগত ত্রুটি ছিল সমস্ত সরবরাহের জন্যে প্রথমদিকে একমাত্র জাপানের উপর নির্ভর করা। যদিও বর্মী জনগণ খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল তবু প্রথম থেকেই প্রয়োজনীয় রসদ স্থানীয় জায়গা থেকে সংগ্রহ করার কোন চেষ্টা করা হয়নি। শেষকালে যখন সে চেষ্টা হয় তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

বর্ষাকাল শুরু হওয়ার পক্ষকাল আগে থেকে বর্ষণ শুরু হয়। ফৌজের সৈন্যদের বর্ষাতি না থাকায়, এমন কি সবসময়ে মাথা গোঁজার জায়গা না থাকায় ও রাস্তাঘাট ডুবে যাওয়ায় অবর্ণনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়। এব্যাপারেও পরিকল্পনার অভাব ছিল।

খাদ্যসংকট ক্রমে চূড়ান্ত রূপ নেয়—প্রত্যেক সৈন্য কেবল দশদিনের রেশন নিয়ে যাত্রা শুরু করে। অপরদিকে মাল পরিবহণের কোন ব্যবস্থা না থাকায় দশদিন সময়ের পরেই খাদ্যসংকট দেখা দেয়। এমনকি যুদ্ধের ফলে শত্রুপক্ষের যেসব ভারতীয় সৈন্য ফৌজের কাছে আত্মসমর্পণ করে তাদের খাদ্যাভাবের জন্যেই ফৌজে না নিয়ে ফিরে যেতে বলা হয়। এসবই রণাঙ্গনের বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে

অক্ষমতার ফলে হয়েছে। জাপ বাহিনীর এ সম্পর্কে আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে আগেই জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। ফৌজেরও নিজস্ব ব্যবস্থায় আগে থেকে তথ্য সংগ্রহের উপরে আরও বেশী গুরুত্ব দেওয়া দরকার ছিল।

ভারতের মধ্যে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এই প্রাণপণের সংগ্রাম সমর্থন করেননি কমিউনিস্ট পার্টিও জাপানকে দখলদার শক্তি প্রচার করে এবং সুভাষচন্দ্রকে জাপানের এজেন্ট বলে প্রচার করে।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নিজেরও প্রচার ব্যবস্থায় ত্রুটি ছিল। প্রচারপত্র ছাপানো হলেও অব্যবস্থার জন্য অনেক ক্ষেত্রে বিলি করা হয় নি। অপরদিকে, জাপানী কর্তৃপক্ষ বিমান থেকে প্রচারপত্র বিলি করতে অস্বীকার করে। প্রচারপত্র বিলি করার ব্যাপারে জাপানের উপরে নির্ভরতা ক্ষতি করেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে এবং ভারতের মধ্যে বেসামরিক জনগণের ভিতরে যদি ঠিকমত প্রচার চালানো সম্ভবপর হত তবে ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে ভারতের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সফল গণঅভ্যুত্থান ঘটানোর সম্ভাবনা প্রসারিত হত। বিপরীতে ভারতের মধ্যে এবং সীমান্তে ব্রিটিশ প্রচার ব্যবস্থা ছিল অনেক আধুনিক নিখুঁত এবং শক্তিশালী।

পরিশেষে বলা যায় যে ব্রিটিশ-মার্কিন বাহিনী ট্যাংক, আরমার্ড কার, বোমারু ও পরিবহণ বিমান প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। তার তুলনায় ফৌজ ও জাপ বাহিনী অনেক সেকেলে ছিল। শত্রুপক্ষের সৈন্যসংখ্যাও বেশী ছিল। আজাদী সৈন্যরা প্রধানত মনোবলে লড়াই করেছেন এবং কোথাও কোথাও ট্যাংকের সঙ্গে তাঁরা লড়েছেন গ্রেনেড, হাতবোমা বা পেট্রলের টিন নিয়ে। এই সময় যুদ্ধে সামরিক ক্ষমতার হিসেবে যদিও ফৌজ ও জাপ বাহিনীর প্রতি সৈন্য পিছু ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর তুলনামূলক হিসাব ধরা যায় (১:৮), তবুও এভাবে যুদ্ধ জয় করা যায় না।**

আজাদ হিন্দ্ আন্দোলনের সাফল্য

উপরে বর্ণিত ত্রুটিগুলি থাকা সত্বেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজাদ হিন্দ্ আন্দোলনের সাফল্যের মধ্যে কোন কোনটি ছিল সুদূরপ্রসারী ও সামরিক, কিছু রাজনৈতিক এবং কোনটি বা তাৎক্ষণিক ফলদায়ী। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদানগুলির কথা নীচে দেওয়া হল—

ভারতীয়দের নিয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ মুক্তি বাহিনী তৈরি করা এর রাজনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্ব অসীম।

ভারতীয় নারীদের নিয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ নারী বাহিনী গঠন করা। নারী মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশিকা।

আজাদ হিন্দ্ আন্দোলনই প্রথম অস্থায়ী সরকার সংক্রান্ত রাজনৈতিক ধারণা ভারতের মুক্তি সংগ্রামে সফলভাবে প্রয়োগ করে। তাছাড়া দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিস্তার ঘটায়। নিজস্ব সরকার ও ফৌজ থাকায় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয়দের নিরাপত্তা ও মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের এবং জাতির (caste) সৈনিকদের জন্যে আজাদ হিন্দ্ ফৌজে এক হেঁসেল এবং পংক্তি ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়।[36] আন্তঃসাম্প্রদায়িক, আন্তঃপ্রাদেশিক এবং নানান জাতি ও বর্ণের মধ্যে আজাদ হিন্দ্ আন্দোলনের প্রেরণায় নিবিড় ঐক্য গড়ে ওঠে। তাছাড়া বেসামরিক ভারতীয় জনগণের মধ্যেও ফৌজের প্রেরণায়, আজাদ হিন্দ্ সরকারের নেতৃত্বে এবং ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের তৎপরতায় প্রকৃত জাতীয় ভাবধারার উন্মেষ ঘটে। জাতীয় ভাষা, বর্ণমালা, পোশাক, সম্বোধন প্রভৃতির সাহায্যে ও ধর্মনিরপেক্ষতার ফলে প্রাদেশিক ভাষাগত, সাম্প্রদায়িক প্রভৃতি বিভেদ দূর করার সর্বোত্তম উদাহরণ স্থাপিত হয়।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ভারতের অভ্যন্তরে ১০০ মাইল পর্যন্ত এগিয়ে আসতে সমর্থ হয় এবং বহুশত বর্গমাইল এলাকা দখল করে।[37] আজাদ হিন্দ্ ফৌজ তার নিজস্ব অধিনায়কদের এবং সামরিক আইনের (I N A. Act) বলে বলীয়ান ছিল। এই আক্রমণ সফল না হলেও এর গুরুত্বপূর্ণ ফল হল ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৮০% ভারতীয় সৈনিক এবং দশ হাজার ভারতীয় অফিসারের মধ্যে আট হাজার ভারতীয় সামরিক অফিসার ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ভারতীয় নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী এবং স্থলবাহিনীর একাংশের মধ্যে আজাদ হিন্দ্ সৈনিকদের লাল কেল্লায় বিচারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিদ্রোহ সৃষ্টি হয়।[38] একই কারণে জনসাধারণের মধ্যে এবং বিশেষ করে ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে জঙ্গী জাতীয় আন্দোলন গড়ে ওঠে। এক কথায় বলা যায়, যুদ্ধে চূড়ান্ত বিচারে হেরে গেলেও আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান করার জন্যে শেষ আঘাত দিয়ে যায়।

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং হিউ টয় মনে করেন যে আজাদ হিন্দ্ সেনানীদের লালকেল্লায় বিচারকে কেন্দ্র করে ভারতীয় জনগণের মনে আজাদ হিন্দ্ আন্দোলন সম্পর্কে যে বিপুল সমর্থন এবং ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যে প্রবল ঘৃণা তৈরি হয় তাকে কাজে লাগিয়ে লাভবান হন জাতীয় কংগ্রেসের নেতারাও, কারণ ইংরেজ শাসনের অবসানের পরে তাঁরাই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।[৩২]

অষ্টম অধ্যায়
সামগ্রিক মূল্যায়ন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সারা বিশ্বের রাজনৈতিক, আর্থনীতিক সামাজিক এবং সামরিক ক্ষেত্রে রূপান্তর এনে দিয়েছে। জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের দিক থেকে দেখতে গেলে এই মহাযুদ্ধ ভারতের মুক্তিসংগ্রামের শেষ অধ্যায় সূচিত করেছে। সামগ্রিক ভাবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এই পর্বে এসে সবচেয়ে ব্যাপকতা এবং তীব্রতা লাভ করে। এসময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক সরকারও অনেক কঠিন চাপের মুখে পড়ে। ভারতে এবং ব্রিটেনে আভ্যন্তর চাপের পাশাপাশি এই সময়ে আন্তর্জাতিক চাপ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। আন্তর্জাতিক চাপসৃষ্টিকারী উপাদানগুলির মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের প্রায় প্রথম পর্ব থেকেই ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে ব্রিটেনের উপরে চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছিল। তাছাড়া বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করলেও আর্থনীতিক ভাবে ব্রিটেনের অবস্থা অত্যন্ত নিঃস্ব হয়ে পড়ে। এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপরে সে অনেক বেশী নির্ভরশীল হয়ে ওঠে এবং তার আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ভূমিকাও খর্ব হয়।

সেই সময়ে ভারতের জাতীয় আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে উপস্থিত হওয়ায় এর অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে ওঠে। এগুলিকেই এই পর্বের বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। নীচে এগুলির কথা উল্লেখ করা হল।

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদ এই দেশে বিকাশ লাভ করতে থাকে। সেই কারণে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরিবর্তন শুরু হয়। পরিবহণ ও যোগাযোগ

অপরদিকে, দক্ষিণপন্থীরা বড় ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এবং জমিদারদের দ্বারা অনেক বেশী প্রভাবিত ছিলেন। সুতরাং কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণপন্থীদের দ্বন্দ্ব উপরোক্ত শ্রেণীগুলির স্বার্থে তীব্রতর হতে থাকে। ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে জিতে কংগ্রেস কয়টি প্রদেশে মন্ত্রিসভা তৈরি করায় শ্রেণীস্বার্থকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব আরও তীব্র আকার নেয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এদের মধ্যে বামপন্থী শিবির ভেঙে যেতে থাকে। এর কারণ ছিল একাধিক। প্রথমতঃ, আন্তর্জাতিক প্রভাব—আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এবং বামপন্থী দলের মধ্যে কিছু অংশের নীতি ও কর্মসূচীতে কিছু মৌলিক পরিবর্তন শুরু হয়। কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল কিন্তু জওহরলাল নেহেরুও এই সময়ের পর থেকে আরও দৃঢ়ভাবে মিত্রপক্ষের সমর্থক হয়ে ওঠেন।

দ্বিতীয়তঃ, সাধারণভাবে এমনকি শক্তিশালী মতাদর্শ ভারতের জনগণের উপরে এবং একচ্ছত্রভাবে কংগ্রেসের মধ্যে গান্ধীজীর প্রভাব অপরিসীম ছিল। তাঁর বিরুদ্ধে কংগ্রেসের মধ্যে সমস্ত বামপন্থী ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় ১৯৩৯ সালে কংগ্রেস সভাপতি পদে গান্ধীজীর মনোনীত প্রার্থীকে তাঁরা হারিয়ে দিয়েছিলেন। এই ঘটনা গান্ধীজীর কাছে ছিল সাংঘাতিক বিপদ সংকেত। ফলে তাঁর সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী নেতাজীকে চূড়ান্ত পরাস্ত করার স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি বামপন্থী শিবিরকে সমস্ত সম্ভাব্য পদ্ধতিতে ভাঙবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর দীর্ঘকালীন পদ্ধতি যে যথেষ্ট কার্যকরী হয়েছিল বামপন্থী সংহতি বিনষ্টির অবস্থাই তার একটি বড় উদাহরণ। ১৯৪২ সালে গান্ধীজী যে আগস্ট আন্দোলন শুরু করেছিলেন মনে হয় তার একটি বড় কারণ ছিল বিপ্লবাত্মক পরিবেশে নিজের নেতৃত্ব বজায় রাখা। কারণ তিনি জানতেন যে গণবিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী এবং আন্দোলনের নেতৃত্ব যাতে গান্ধীজীর হাত থেকে সশস্ত্র সংগ্রামের নেতাদের হাতে চলে না যায় সে ব্যাপারে তিনি যে সচেষ্ট ছিলেন তা এই আন্দোলনে সুচেতা কৃপালনী প্রমুখের ভূমিকা থেকে আমরা দেখেছি।

তৃতীয়তঃ, বামপন্থীদের মধ্যে পরস্পর আস্থাবিশ্বাসের অভাবও ছিল। বামপন্থী নেতাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ব্যক্তিগত ঈর্ষা কখনও কখনও বামপন্থী আন্দোলনের সংহতির পক্ষে ক্ষতিকারক হয়েছে বলে মনে হয়। কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী চ্যালেঞ্জ গড়ে তোলার জন্য দরকার ছিল গান্ধীজীর পাশাপাশি কোন

জনপ্রিয় বামপন্থী নেতাকে তুলে ধরে। উপরন্তু, বামপন্থীদের মধ্যে মতাদর্শগত বিভিন্নতা, এমনকি বিরোধ, সাংগঠনিক রূপ নিয়েছিল। সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে বামপন্থী জাতীয়তাবাদী এবং কমিউনিস্টদের মধ্যে বিরোধ এর একটি উদাহরণ। অপরদিকে সি. এস. পি. র মধ্যে গান্ধীবাদী ও মার্কসবাদীদের দ্বন্দ্ব এই দলের সংগঠনের সংহতি নষ্ট করে। অথচ জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মূল বামপন্থীদের কর্তব্য ছিল বৃহত্তর জনগণের প্রতিনিধিত্ব ভিত্তিক ন্যূনতম কর্মসূচী নিয়ে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রাম ফ্রন্ট গড়ে তোলা। এ কাজে বামপন্থীরা ব্যর্থ হন। একটা বড় কারণ সেকালের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বামপন্থী নেতৃবৃন্দের অন্যতম সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে অন্যান্য বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করতে না পারা। বামপন্থী হিসেবে খ্যাত অপর জনপ্রিয় নেতা জওহরলাল নিজে কখনো গান্ধীজীর প্রতিযোগী ভূমিকায় যেতে আগ্রহী হন নি। কিন্তু সুভাষ বসু ও কমিউনিস্টদের মধ্যে কাজের ঐক্য হতে না পারার সবচেয়ে বড় কারণ সেসময়ের ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পূর্ণ ভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টিকে যান্ত্রিক ভাবে অনুসরণ করা। তাঁরা তখন ভারতের নিজস্ব অবস্থা (specific condition), সমাজ ব্যবস্থা প্রভৃতি বিশ্লেষণের সংগ্রামী অভিজ্ঞতা দিয়ে বিচার করার চেষ্টা করেন নি

বিদেশের মাটিতে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের এই পর্ব সংগ্রামের ইতিহাসে নতুন মাত্রা সংযোজিত করে। আমরা আলোচনায় দেখেছি যে এই প্রয়াসের ফলে ভারতে ফ্যাসিস্ট্ আধিপত্য প্রসারিত হবার সম্ভাবনা সম্পর্কে যে প্রচার হয়েছিল বাস্তবে তেমন কোন কারণ ছিল না। তবে এই পরীক্ষা যে সামরিক ভাবে বিপজ্জনক ছিল সে কথা নেতাজী নিজেও স্বীকার করেছেন। অবশ্য তাঁর নিজের দিক থেকে যুদ্ধের পুরো সময় বন্দী হয়ে থাকা এবং এই ঝুঁকি নেওয়ার মধ্যে আর কোন পথ খোলা ছিল না।[১০]

সার্বিক বিচারে বলা যায় যুদ্ধশেষে ভারতের ভিতরে ও বাইরে স্বাধীনতার সংগ্রাম জয়লাভ করতে না পারায় শাসকশ্রেণীর মুখাপেক্ষী প্রতিক্রিয়ার রাজনীতি শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং ফলত দক্ষিণপন্থীরা, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করে সাম্প্রদায়িক বিভেদের ভিত্তিতে বিখণ্ডিত দেশের ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে ও রক্তের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেন।[১১] স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামীদের রক্তদানের গুরুত্ব অবশ্য তাতে ম্লান হবার নয়।

তথ্য পঞ্জী

প্রথম অধ্যায়

১। R. Palme Dutt, *India Today* পৃ ৫৩৮।

২। তদেব, পৃ ৫৪১।

৩। G N Curzon, *Problems of the Far East* (1894) থেকে উদ্ধৃত করেছেন R. Palme Dutt, *India Today*, পৃ ৫৫০।

৪। *Eastern Armaments Supplement*, October 19, 1929 থেকে উদ্ধৃত, তদেব, পৃ ৫৪২।

৫। তদেব।

৬। ব্রিটেনের শিল্পায়ন এবং ঐশ্বর্যশালী হয়ে ওঠার প্রয়োজনে ভারতবর্ষকে যেভাবে লুণ্ঠন করা হয় তা কার্ল মার্ক্স তাঁর বহু রচনায় উল্লেখ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ দ্রষ্টব্য: Karl Marx, *Capital*, Vol. I, পৃপৃ ৭৫৬-৫, Karl Marx, *Selected Correspondence*, পৃপৃ ৩১৮, ৩৩৭, অথবা Suniti Kumar Ghosh, *The Indian Big Bourgeoisie* etc. পৃপৃ ১৮-৯।

৭। R. Palme Dutt, *India Today*, পৃ ৫৫৭।

৮। তদেব, পৃ ৫৫৫।

৯। B. R. Tomlinson, *The Indian National Congress and the Raj 1929-1942 The Penultimate Phase*, Chapter I

১০। R. C. Majumdar, *History of Freedom Movement in India*, Vol III, পৃপৃ ৪৬-৯।

১১। তদেব, পৃপৃ ৫০-২।

১২। তদেব, পৃপৃ ২৬-৭।

১৩। যে সমস্ত নেতা অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে গান্ধীজীর উত্থাপিত প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন তাঁদের মধ্যে তিলক ছাড়া চিত্তরঞ্জন দাশ, অ্যানি বেসান্ত, বিপিন চন্দ্র পাল এবং মহম্মদ আলি জিন্নার নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তদেব, পৃপৃ ৭৬-৭৮।

১৪। তদেব, পৃঃ ১৫৫-৬০।

১৫। B R Tomlinson, *The Indian National Congress and the Raj etc.*, পৃঃ ১৮, ২১।

R Palme Dutt, *India Today*, Part II, Chapter VI.।

১৬। R C. Majumdar, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ ৩১৭।

Nimai Pramanik, *Gandhi and the Indian National Revolutionaries*, পৃ ১০৫।

কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধীজি এবং তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে বামপন্থী ও বিপ্লবীদের মতপার্থক্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য Nimai Pramanik, তদেব, পৃঃ ৯৭-১০৬ এবং Buddhadeva Bhattacharya (ed), *Freedom Struggle and Anushilan Samiti*, Vol I, পৃঃ ২৩১-৩ দ্রষ্টব্য।

১৭। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে ১৯২৮ সাল থেকে কৃষক ও শ্রমিক দল গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা নেয় এবং কৃষক ও শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার দিকে দৃষ্টি দেয়। তিরিশ দশকের প্রথম থেকে বাংলার বিভিন্ন জেলায় কৃষক সম্মেলন এবং সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৯৩৬ সালে সারা ভারত কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। (ক) আবদুল্লাহ রসুল, **কৃষক সভার ইতিহাস**, পৃঃ ৫১, ৫৯-৬০ [বইটির ১৯৮০ সালের যে সংস্করণ ব্যবহার করা হয়েছে তাতে মুদ্রণে কয়েকটি পৃষ্ঠার একই নম্বর দুবার ছাপা হয়েছে। ফলে ৫১ পৃষ্ঠা দুবার পাওয়া যাবে। সেইজন্যে এক্ষেত্রে সূচীপত্রে যেভাবে পৃষ্ঠাসংখ্যা দেওয়া আছে তাকে অনুসরণ করা হয়েছে।] (খ) R. Palme Dutt, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৩৮২-৪০৫, ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশ ও সমাজবাদী চিন্তার বৃদ্ধি প্রসঙ্গে একটি সামগ্রিক সংক্ষিপ্ত চিত্র পাওয়া যাবে।

১৮। Subhas Chandra Bose, *The Indian Struggle* : 1920-42, পৃ ৩৫৭।

১৯। সি এস পি-র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Asim Kumar Chaudhuri, *Socialist Movement in India*, পৃঃ ৩০-৪৯। বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস কর্তৃক মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য R Palme Dutt, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৫২৫ ৩০,

এবং Subhas Chandra Bose, "The Pros and Cons of Office Acceptance" *Crossroads*, পৃঃ ৫৬-৬৪।

২০। Kali Charan Ghosh, *The Roll of Honour Anecdotes of Indian Martyrs*, পৃঃ ২৪৬ ৩৪৪, ৫২২ ৫, ৫৬৩ ৯।

২১। R C Majumdar, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৫৭৯।

২২। Subhas Chandra Bose, *Crossroads*, পৃঃ ১৭ ২১। সুভাষচন্দ্র তাঁর ভাষণে বলেন, "More important than the question of the proper working of the Congress Governments is the immediate problem of how to oppose the inauguration of the federal part of the Constitution ..." [তদেব, পৃ ১৭]।

ঐ ভাষণেই তিনি বলেন : "We have to fight Federation by all legitimate and peaceful means not merely along constitutional lines—and in the last resort, we may have to resort to mass civil disobedience which is the ultimate sanction we have in our hands. ." [তদেব, পৃ ২১]।

২৩। R. C. Majumdar, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৫৭৯-৮০।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। Subhas Chandra Bose, *Crossroads*, যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রস্তাবের বিপক্ষে সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা, পৃঃ ৮৫-৬। কংগ্রেস সভাপতি পদে নির্বাচন সংক্রান্ত বিবৃতিগুলির জন্য পৃঃ ৮৭-১০৪ দ্রষ্টব্য।

২। Nripendra Nath Mitra (ed), *Indian Annual Register*. 1939, Vol. I, Jan-June।

৩। Subhas Chandra Bose, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ১০৫-৬। স্থানাভাব বশত এই বইতে সভাপতি নির্বাচনের ব্যাপারে আলোচনা বিস্তারিত করা অথবা বিবৃতিগুলি থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভবপর হল না।

৪। R. C Majumdar, *History of the Freedom Movement in India*, Vol. III, পৃ ৫২৬।

৫। B R Tomlinson, *The Indian National Congress and the Raj* etc, পৃ ১৪৪।

৬। তদেব।

৭। তদেব।

৮। Francis G Hutchins, *Spontaneous Revolution The Quit India Movement*, পৃপৃ ১৮৬-৭।

৯। জাতীয় মহাফেজখানা, স্বরাষ্ট্র ফাইল নং, 3/1[illegible]/40 Poll (1), তদেব, পৃ ১৮৯।

১০। ১৯৪০ সালের ২৫ এপ্রিল ম্যাক্সওয়েল কর্তৃক ভাইসরয়ের একান্ত সচিবকে প্রেরিত পত্র। জাতীয় মহাফেজখানা, স্বরাষ্ট্র ফাইল নং, 3/13/40/Poll (1), তদেব, পৃ ১৯০।

১১। জাতীয় মহাফেজখানা, স্বরাষ্ট্র ফাইল নং, 6/8/40 Poll (1), তদেব, পৃ ১৯২।

১২। ১৯৪১ সালের ২০ এপ্রিল ভাইসরয়ের কাছে উত্তর প্রদেশের গভর্নর কর্তৃক প্রেরিত রিপোর্ট নং, UP 92, জাতীয় মহাফেজখানা, স্বরাষ্ট্র ফাইল নং, 3/31/40, Poll (1), তদেব, পৃ ১৯৩, এবং পৃ ১৯৫। তাঁর রিপোর্টের বিশেষ অংশ : "If we are out to smash the Congress as a political party in the country, we alienate all the support we might get from its half-hearted supporters. I do not question the desirability of smashing the Congress but I submit that this is not the way to do it. Having said that the future Constitution of India will, subject to certain safeguard, be decided by Indians themselves, it seems anomalous for us to go out and smash the Congress on any other ground but they are interfering in the war." [পৃ ১৯৩]।

১৩। "I am not just now thinking of India's deliv-

erance. It will come, but what will it be worth if England and France fall, or if they come out victorious over Germany ruined and humbled ?"—Gandhiji in *Harijan*, 9 Sept, 1939, R. C. Majumdar, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৫৯৭।

১৪। "We do not approach the problem with a view to taking advantage of Britain's difficulties. In a conflict between democracy and freedom on the one side and Fascism and aggression on the other, our sympathies must inevitably lie on the side of democracy. I should like India to play her full part and throw all her resources into the struggle for a new order"—J. L. Nehru in *The Statesman*, 10 Sept 1939, তদেব।

১৫। B. R. Tomlinson, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৪৩।

১৬। Nripendra Nath Mitra (ed.), পূর্বোল্লিখিত, Vol. II, পৃপৃ ২২৬-৮।

১৭। তদেব, পৃ ২৩১।

১৮। R. C. Majumdar, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৫৯৯।

১৯। R. C. Majumdar, তদেব, পৃ ৫৯৮।

Francis G. Hutchins, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৮৭।

২০। R. C. Majumdar, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৫৯২।

২১। Francis G. Hutchins, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৮৯।

২২। R. C. Majumdar, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৬০১।

২৩। তদেব।

২৪। Abul Kalam Azad, *India Wins Freedom*, পৃ ৩৪।

২৫। তদেব।

২৬। R. C. Majumdar, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৬০২।

২৭। Abul Kalam Azad, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৩৪।

সারা ভারত কংগ্রেস কমিটি পুনায় ১৯৪০ সালের ২৭ এবং ২৮ জুলাই ১৬৮ জন সদস্যের উপস্থিতিতে যে প্রস্তাব গ্রহণ করে বলে এই বইতে বলা

৪৩। Abul Kalam Azad, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৫।

৪৪। তদেব, পৃপৃ ৫০-১।

৪৫। তদেব, পৃপৃ ৬৪-৫।

তৃতীয় অধ্যায়

১। Subhas Chandra Bose, *The Indian Struggle, 1920-42*, পৃ ৩৩৩।

২। তদেব, পৃ ৩৩৭।

৩। তদেব, পৃপৃ ৩৩৯-৪০।

৪। তদেব, পৃপৃ ৩৪০-১।

৫। L. P. Sinha, *The Left Wing in India, 1919-1947*, পৃ ৪৯২।

৬। Subhas Chandra Bose, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৩৪১।

৭। L. P. Sinha, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৪৯২।

৮। Subhas Chandra Bose, *Crossroads*, পৃ ২৪৪।

৯। তদেব, পৃ ২২২।

১০। L. P. Sinha, পূর্বোল্লিখিত পৃ ৪৯৩।

১১। Subhas Chandra Bose, *Crossroads*, পৃ ২৪৪।

১২। L. P. Sinha, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৪৯৩।

১৩। Subhas Chandra Bose, *The Indian Struggle*, পৃ ৪০৭

১৪। L. P. Sinha, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৪৯৪।
Subhas Chandra Bose, *The Indian Struggle*, পৃ ৪০৫।

১৫। তদেব, পৃ ৩৪৪।

১৬। L. P. Sinha, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৪৯৫।

১৭। তদেব, পৃ ৪৯৬।

১৮। *World News and Views* June 28, 1940 তে প্রকাশিত B. Asche-এর প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত। L. P. Sinha, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ৪৯৭-৮।

১৯। L. P. Sinha, পূর্বোল্লিখিত, পৃষ্ঠা ৪৯৫-৬।

২০। তদেব, পৃষ্ঠা ৫০১-২।

২১। তদেব, পৃষ্ঠা ৪৯৯-৫০০।

২২। সি. এস. পি. ও র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি সংক্রান্ত আলোচনার (এই বইয়ের পৃষ্ঠা ৪০-৬) সমস্ত তথ্যের সূত্র L. P. Sinha, পূর্বোল্লিখিত, পৃষ্ঠা ৫০২-১১।

চতুর্থ অধ্যায়

১। L. P. Sinha, *The Left Wing in India, 1919-1947*, পৃ ৫১৩।

২। তদেব, পৃষ্ঠা ৫১৫, ৫১৭, ৫১৯-২০, ৫২২।

৩। তদেব।

M. R. Masani, *The Communist Party of India*, পৃষ্ঠা ৮০-৩।

৪। সি. পি. আই-এর দলিল—

Hiren Mukherjee, *Our Freedom Struggle and the Communist Party, Some Reflections and Observations*।

Dilip Basu, Foreword by C. Rajeswara Rao, *1942 August Struggle and the Communist Party of India*।

Goutam Chattopadhyay, *Arun Shourie's Slander Rebutted, History Has Vindicated the Communists*।

৫। সি. পি. আই (এম)-এর দলিল—

M. Basavpunnaiah, *Quit India Call and the Role of Communists* (A Reply to Arun Shourie)।

৬। আর. এস. পি-র দলিল

R. S. P. *On Russo-German War*, পৃ ১৮।

৭। আর. সি. পি. আই-র দলিল—

Polit Bureau, C. C., R. C. P. I. (ed.),

Historical Development of Communist Movement in India, পৃপৃ ৩৫-৪৪।

Saumyendra Nath Tagore, *Sahajanand, Kornilov and People's War*।

পঞ্চম অধ্যায়

১। R. C. Majumdar, *History of the Freedom Movement in India*, Vol. III, পৃ ৬৩৪।

২। তদেব, পৃ ৬৩৫।

৩। Abul Kalam Azad, *India Wins Freedom*, পৃ ৭২।

৪। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৪২ সালের ১৪ জুলাই যে প্রস্তাব গ্রহণ করে স্থানাভাববশত এখানে সেই মূল প্রস্তাবটি তুলে দেওয়া সম্ভবপর হল না। এই প্রস্তাবের পূর্ণ বয়ানের জন্যে তদেব, পৃপৃ ৭৭-৯ দ্রষ্টব্য।

৫। Subhas Chandra Bose, *Indian Struggle*, পৃ ৩২০।

৬। Abul Kalam Azad, পূর্বে লিখিত, পৃপৃ ৮০- ।

৭। তদেব, পৃ ৮১।

৮। "Everyone of you should from this moment onward consider yourself a freeman or woman and act as if you are free I am not going to be satisfied with anything short of complete freedom . We shall do or die. We shall either free India or die in the attempt."—Gandhiji

R. C. Majumdar, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৬৪৪। এছাড়া Subhas Chandra Bose, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৩৫১ এবং Abul Kalam Azad, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ৮২-৩ দ্রষ্টব্য।

৯। Abul Kalam Azad, তদেব, পৃপৃ ৮৩-৭ দ্রষ্টব্য।

১০। Subhas Chandra Bose, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ৩৫০-১।

১১। L. P. Sinha, *The Left Wing in India*, পৃপৃ ৫২০-১।

১২। তদেব, পৃপৃ ৫২২-৩।

১৩। তদেব, পৃপৃ ৫২৫-৭।

১৪। Arun Chandra Bhuyan, *The Quit India Movement : The Second World War and Indian Nationalism*, পৃ ১০৪।

১৫। L P Sinha, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৫১৯।

১৬। Arun Chandra Bhuyan, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ১১১-২।

১৭। L P Sinha, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৫১৯।

১৮। Subhas Chandra Bose, *Selected Speeches*, পৃপৃ ১৫১-২।

১৯। Buddhadeva Bhattacharya, *Origins of the RSP : From National Revolutionary Politics to Non conformist Marxism*, পৃ ৩৮। বিশদ আলোচনার জন্যে পুরো পুস্তিকাটি দ্রষ্টব্য।

২০। L. P. Sinha, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৫২।

২১। তদেব, পৃ ৫২৮।

২২। Polit-Bureau, C C, R C P I. (ed.), *Historical Development of Communist Movement in India*, পৃ ৬৩।

২৩। L. P. Sinha, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ৫২৮ ৩০।

২৪। আগস্ট আন্দোলনের শিক্ষা।

২৫। R C. Majumdar, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ৬৭৯-৮১।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। A Moin. Zaidi, *The Way Out to Freedom . An Enquiry into the Quit India Movement Conducted by Participants*, পৃ ৯।

২। Arun Chandra Bhuyan *The Quit India Movement etc* পৃপৃ ১০৬-৭।

৩। তদেব, পৃ ১১১।

৪। A. Moin Zaidi, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১১।

৫। তদেব, পৃপৃ ১৫-৮।

৬। তদেব, পৃ ২১।

৭। Govind Sahai, '42 *Rebellion etc.*, পৃঃ ১৪৭-৮, ২২৩, ২৭৮-৯।

R. C. Majumdar, *History of Freedom Movement in India*, Vol. III, পৃপৃ ৬৫৩-৭।

৮। Govind Sahai, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ২৭৫।

৯। তদেব, পৃপৃ ২৭৫-৯৫।

১০। তদেব, পৃপৃ ২৭৪, ২৯৫, ৩০০।

R. C. Majumdar, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ৬৭৮-৮০।

১১। A. Moin Zaidi, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৩৫।

১২। Francis G. Hutchins, *Spontaneous Revolution etc.* পৃ ২১৫।

১৩। R. C. Majumdar, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৬৫৭।

১৪। তদেব, পৃ ৬৫৮।

১৫। সে যুগে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মধ্যে বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশ অনেকাংশেই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৬। কংগ্রেস রিপোর্ট দ্রষ্টব্য, A. Moin Zaidi, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ১৬-৮।

১৭। তদেব, পৃপৃ ৬০-৪।

১৮। Abul Kalam Azad, *India Wins Freedom*, পৃ ৯০।

১৯। তদেব, পৃপৃ ৪১, ৭৪, ৮২, ৮৫।

২০। P. N. Chopra (ed.), *Quit India Movement etc.* পৃপৃ ৫-৭, ১০।

২১। Abul Kalam Azad, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৯২।

২২। তদেব, পৃ ৯৩।

২৩। R. C. Majumdar, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৬৯৫।

২৪। Abul Kalam Azad, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ৯৩-৪।

২৫। তদেব, পৃ ৯৪।

২৬। Arun Chandra Bhuyan, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ১৩৩-৪৩।

আন্দোলন পরিচালক গোষ্ঠির মতবিরোধ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য এইখান থেকে নেওয়া হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়

১। N. G. Ganpuley, *Netaji in Germany, A Little Known Chapter*, পৃপৃ ১৭৫-৭।

Hugh Toye, *Subhas Chandra Bose, The Springing Tiger A Study of a Revolution*, পৃপৃ ৫৯-৬১।

২। N. G Ganpuley, পূর্বোল্লিখিত, পৃ XIX।

৩। তদেব, পৃপৃ ১৯-২০।

৪। তদেব, পৃপৃ ২৮-৯।

৫। তদেব, পৃপৃ ১৯-২৭।

৬। তদেব, পৃপৃ ৪১-২।

৭। তদেব, পৃপৃ ৪৭-৫৩।

৮। Toye, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৬৪।

৯। N. G Ganpuley, পূর্বোল্লিখিত, পৃ IX।

১০। তদেব, পৃপৃ ৭০-১।

১১। তদেব, পৃ ৭৩।

১২। তদেব, পৃ ৭৮।

১৩। তদেব, পৃ ৮৩। Hugh Toye, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ৭০-১।

১৪। N. G. Ganpuley, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ১১০-৩, ১২২।

১৫। Hugh Toye, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ৬৭-৯।

N. G. Ganpuley, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ১২৩-৪।

১৬। তদেব, পৃপৃ ১২৪, ১৩৮-৯।

Hugh Toye, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৭৯।

নেতাজী পূর্ব এশিয়ায় রওনা হবার পরে ইওরোপে অবস্থিত আজাদ হিন্দ

৩৫। A. C Chatterjee, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ১৫৪, ১৬০-১।

৩৬। তদেব, পৃ ১৫০।

৩৭। তদেব, পৃ ১৫১।

৩৮। Hugh Toye, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৯৮।

৩৯। A. C. Chatterjee, পৃ ১৫৫।

৪০। তদেব, পৃপৃ ১৫৬-৫৭, ৫৯, ১৬০।

৪১। Hugh Toye, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৯২।

৪২। A C Chatterjee, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ১৬৬, ১৭১-২।

৪৩। তদেব, পৃপৃ ১৩৪, ১৬৪-৫, ১৭৫।

৪৪। তদেব, পৃপৃ ১৭৮-৯০।

৪৫। তদেব, পৃপৃ ২০৩—১০।

৪৬। তদেব, পৃপৃ ২১১-২, ২২৬।

৪৭। তদেব, পৃপৃ ২৪০-৫।

৪৮। তদেব, পৃপৃ ২৫৩-৫।

৪৯। তদেব, পৃ ২২৯।

৫০। তদেব, পৃপৃ ২১৮, ২২৯-৩০, ২৩৪, ২৭৭, ২৮২। এছাড়া দ্রষ্টব্য ১৯৪৫ সালের ২১ মে ব্যাংককে নেতাজী প্রদত্ত বক্তৃতা। Subhas Chandra Bose, *Selected Speeches*, পৃপৃ ২২৮-৯।

৫১। A. C. Chatterjee, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ২৬৪।

৫২। তদেব, পৃপৃ ২৬৮-৭১।

৫৩। তদেব, পৃপৃ ২৭১-৮৭।

৫৪। তদেব, পৃপৃ ২৯৪, ৩১৩।

ভারতীয় রাজকীয় নৌবাহিনী (Royal Indian Navy)-র সেনিকদের বিদ্রোহ [ডিসেম্বর, ১৯৪৫ — ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬] সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনার জন্যে B C Dutt, *Mutiny of the Innocents* বই-এর পৃপৃ ৭৪-১৯৯ দ্রষ্টব্য।

৫৫। A C Chatterjee, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ২৯৭-৩০৮।

৫৬। তদেব, পৃ ৩১২।

৫৭। তদেব, পৃ ৩১১।

৫৮। তদেব, পৃ ৩১৩।

৫৯। Hugh Toye, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ১১০-১৪।

R. C. Majumdar, *History of Freedom Movement in India* Vol, III, পৃঃ১৪৮-৫০।

অষ্টম অধ্যায়

১। C. F. Andrews and Mukhejee, The Rise and Growth of the Congress, 1938.

২। A. R. Desai, *Social Background of Indian Nationalism*, পৃঃ ২০০-৩।

Sumit Sarker, *The Swadeshi Movement in Bengal, 1903-1908*, পৃঃ ১০৮-৬৮।

Aditya Mukherjee, "Indian Capitalist Class and Congress on National Planning and Public Sector, 1930-47" in K. N. Panikkar (ed), *National and Left Movements in India*, পৃঃ ৪৫-৭৯।

৩। R. P Dutt, *India Today*, Chapter XII "Rise of Labour and Socialism" দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৩৮২ ৪০৫

A. R. Desai, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ২১০-৪।

৪। তদেব, পৃ ১৮৩।

৫। Partha Chatterjee, *Agrarian Relations and Politics in Bengal : Some Considerations on the Making of the Tenancy Act Amendment, 1928*, পৃঃ ২৫ ৩৫ উদাহরণ হিসেবে দ্রষ্টব্য।

৬। সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম এ ব্যাপারে দ্রষ্টব্য।

A. R. Desai (ed), *Peasant Struggle in India*, "Agrarian Struggles in the 19th Century." Part II, পৃঃ ১২৯-২০৩ অংশ দ্রষ্টব্য।

৭। A. R. Desai, *Social Background* etc. পৃঃ ২৮৭-৮।

আবদুল্লাহ রসুল, কৃষক সভার ইতিহাস, পৃঃ ৫৭-৬৭।

D. N. Dhanagare, "The Politics of Survival: Peasant Organisations and Left Wing in India, 1925-46", in K. N. Panikkar (ed.), পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৮০-১০৪।

৮। A. R. Desai (ed.), *Peasant Struggle* etc., Part V, Introduction, পৃঃ ৪১৫-২৭।

Aditya Mukherjee, পূর্বোল্লিখিত, বিশেষত Sect. II এবং III, পৃঃ ৫২-৭৯ দ্রষ্টব্য।

Sumit Sarkar, *Modern India, 1885-1947*, পৃঃ ৩৫৮-৬১।

৯। R. P. Dutt, পূর্বোল্লিখিত, Chapter XI, "Three Stages of National Struggle," পৃঃ ৩১৯-৮১।

Subhas Chandra Bose, *Indian Struggle*, পৃঃ ৩২৯।

১০। ১৯৪৪ সালের ৬ জুলাই আজাদ হিন্দ রেডিও থেকে প্রচারিত এবং ১৮ জুন, ১৯৪৫-এ সিঙ্গাপুর রেডিও থেকে প্রচারিত যথাক্রমে গান্ধীজী এবং দেশবাসীর উদ্দেশে নেতাজীর বেতার ভাষণ দুটির উল্লেখ এ ব্যাপারে করা যেতে পারে। A. C. Chatterjee, *Indian Struggle for Freedom*, পৃঃ ২১৮-২৫, ২৭১-৪।

Subhas Chandra Bose, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৩৫৪-৬।

১১। Abul Kalam Azad, "The Prelude to Partition," "The Interim Governent", "The Mountbatten Mission," "The End of a Dream" প্রভৃতি অধ্যায় দ্রষ্টব্য, *India Wins Freedom*, পৃঃ ১৫২-২০৫।

V. P. Menon, *The Transfer of Power in India*, Chapters 15-18 এবং Appendix 11 : "The Indian Independence Act, 1947" ও Appendix 12 : "Congress Comments on the Draft Indian Independence Bill" দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থ পঞ্জী

লেখকের পদবীর আদ্যাক্ষর অনুযায়ী বর্ণানুক্রমে সজ্জিত। বাংলা বইগুলির বিবরণ বাংলা অক্ষরে দেওয়া হয়েছে।

Andrews, C. F and Mookerji, Girija . The Rise and Growth of the Congress, 1938, Allen and Unwin, London

Azad, Maulana Abul Kalam *India Wins Freedom, An Autobiographical Narrative*, Sangam Books, New Delhi, 1978.

Basavpunnaiah, M *Quit India Call and the Role of Communists (A reply to Arun Shourie)*, National Book Centre, New Delhi, 1984.

Basu, Dilip : *1942 August Struggle and the Communist Party of India*, Communist Party Publication, No. 8, New Delhi, June 1984

আগষ্ট আন্দোলনের শিক্ষা, দুলাল বসু কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৯৪৬।

Bhuyan, Arun Chandra *The Quit India Movement, The Second World War and Indian Nationalism*, Manas Publiations, New Delhi, 1975

Bhattacharya, Buddhadeva (ed) *Freedom Struggle and Anushilan Samiti*, Vol. I, Anushilan Samiti, Calcutta, 1979

——— . *Origins of the RSP, From National Revolutionary Politics to Non Conformist Marxism*, Publicity Concern, Calcutta, November, 1982.

Bose, Subhas Chandra . *The Indian Struggle, 1920-42*, Asia Publishing House, Bombay, 1964

— — — : *Crossroads*, Asia Publishing House, Bombay, 1962.

— — — : *Selected Speeches of Subhas Chandra Bose*, Publications Division, Delhi, October, 1962

Communist Party of India (CPI) : *Party Letter*, No 44, September-October, 1941.

Chopra, P N (ed) : *Quit India Movement, British Secret Report* Thomson Press (India) Ltd, Faridabad, 1976.

Chatterji, Maj-Gen A C : *India's Struggle for Freedom*, Chuckervertty, Chatterjee and Co Calcutta, 1947

Chatterjee, Partha : *Agrarian Relations and Politics in Bengal, Some Considerations on the Making of the Tenancy Act Amendment, 1928*, (Mimeo), Occasional Paper No 30, Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta, 1980

Chattopadhyay, Goutam : *Arun Shourie's Slander Rebutted History has vindicated the Communists*, Communist Party Publication, No 9., New Delhi, June, 1984.

Choudhuri, Asim Kumar : *Socialist Movement in India, The Congress Socialist Party* (1934 1947), Progressive Publishers, Calcutta, March, 1980.

Dutt, B. C : *Mutiny of the Innocents*, Sindhu Publications Pvt. Ltd , Bombay, 1971.

Dutt, R. Palme : *India Today*, Manisha Granthalaya, Calcutta, 1970 (2nd ed.)

Desai, A. R : *Social Background of Indian Nationalism*, Popular Prakashan, Bombay, 1981 (reprint).

— — — (ed), *Peasant Struggle in India*, Oxford University Press, Delhi, 1979.

Ghosh, Suniti Kumar : *The Indian Big Bourgeoisie, Its*

Genesis, Growth and Character, Subarnarekha, Calcutta, 1985.

Ghosh, Kali Charan : *The Roll of Honour, Anecdotes of Indian Martyrs*, Vidya Bharati, Calcutta, April, 1965.

Ganpuley, N G *Neta i in Germany, A Little Known Chapter*, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, 1959

Hutchins, Francis G. *Spontaneous Revolution The Quit India Movement*, Manohar, Delhi, 1971

Marx, Karl : *Capital*, Vol 1, Progress publishers, Moscow, 1974 (reprint).

————: *Selected Correspondence*, Progress Publishers, Moscow, 1965.

Majumdar, R. C. . *History of the Freedom Movement in India*, Vol. III, Firma K L. Mukhopadhyay, Calcutta, 1963

Mitra, Nripendra Nath (ed) : *Indian Annual Register*, Vols. I & II, 1939 and Vol II, 1940, Calcutta.

Masani, M R. : *The Communist Party of India, A Short History*, Derek Verschoyle, London, 1954

Menon, V P *The Transfer of Power in India*, Orient Longman, Bombay, 1957.

Mukherjee, Hiren : *Our Freedom Struggle and the Communist Party, Some Reflections and Observations*, Communist Party Publication, No 2, New Delhi, January, 1984.

Panikkar, K N. (ed) : *National and Left Movement in India*, Vikas Publishing House, New Delhi, 1980.

Pramanik, Nimai *Gandhi and the Indian National Revolutionaries*, Sribhumi Publishing Co , Calcutta, 1984.

রসুল, আবদুল্লাহ : কৃষকসভার ইতিহাস, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, জুলাই ১৯৮০ (২য় সংস্করণ)।

রায়, সুপ্রকাশ : ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, ডি. এন. বি. এ., কলকাতা, ১৩৮০ (৩য় সংস্করণ)।

R. C. P. I. Polit Bureau, C. C. (ed.) : *Historical Development of Communist Movement in India*, n. d.

R. S. P. : **On Russo-German War**

Sinha L. P. : *The Left Wing in India, 1919-1947*, New Publishers, Muzaffarpur, 1965.

Sahai, Govind : *'42 Rebellion (An Authentic Review of the Great Upheaval of 1942)*, Rajkamal Publications, Delhi, 1947.

Sarkar, Sumit : *The Swadeshi Movement in Bengal, 1903-1908*, People's Publishing House, New Delhi, 1977 (reprint).

———. *Modern India 1885-1947*, Macmillan, New Delhi, 1983.

Tagore, Saumyendranath : *Sahajanand, Kornilov and People's War*, n. d.

Tomlinson, B. R. : *The Indian National Congress and The Raj, 1929-1942 : The Penultimate Phase*, Macmillan, London, 1976.

Toye, Hugh : *Subhas Chandra Bose, The Springing Tiger, —A Study of a Revolution*, Jaico Publishing House, Bombay, 1978.

Zaidi, A. Moin : *The Way out to Freedom : An Enquiry into the Quit India Movement Conducted by Participants*, Orientalia, New Delhi, 1973.

নির্দেশিকা